

ফাঁসীর মঞ্চ থেকে

জুলিয়াস ফুচিক

বিশ্ব শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত

জুলিয়াস ফুচিক

ফাঁসীর মঞ্চ থেকে

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ

প্রথম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯
দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ
এপ্রিল ১৯৫২

প্রকাশক
সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলিকাতা ১২
মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

দাম একটাকা বার আনা

প্রকাশকের বক্তব্য

১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ এই বইখানাকে বাংলার পাঠকেরা সম্যক মর্যাদা দিয়েছেন, যার ফলে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার প্রয়োজন হোল। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর ইতিমধ্যে এই বইখানার গুরুত্ব আরও অনেক বেড়ে গেছে, বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের অমূল্য হাতিয়ার হিসাবে ১৯৫০ সালে "বিশ্ব শান্তি পুরস্কার" লাভ করেছে, তাই দ্বিতীয় সংস্করণ বের করবার জরুরী তাগিদ আমরা অনুভব করছি।

দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্ট হিসাবে জুলিয়াস্ ফুচিকের, তাঁর স্ত্রী গুস্তা ফুচিকোভার কাছে লেখা কয়েকখানা চিঠি সংযুক্ত করা হয়েছে। আমেরিকার প্রগতিশীল মাসিক পত্র "ম্যাসেস এণ্ড মেনস্ট্রীম" কাগজ থেকে এই চিঠিগুলো বাংলা দেশের প্রগতিশীল মাসিক পত্র "পরিচয়"-এ অনূদিত হয়, তা থেকেই সংগৃহীত হয়েছে, এই চিঠিগুলো।

দ্বিতীয় সংস্করণে অনুবাদ, বানান ও ছাপার ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করা হয়েছে যথাসাধ্য, দাম বাড়ানো হোল না, যদিও আজকাল প্রকাশনার খরচ অনেক বেড়ে গেছে।

আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণও প্রথম সংস্করণের মত বাংলার পাঠক সাধারণের কাছে সমাদৃত হবে।

প্রকাশক

১

পরিচিতি

নাৎসী জল্লাদের উদ্যত ফাঁসের নিচে বসে জ্বলিয়াস ফ্বচিক এই বইখানি লিখেছিলেন। বইখানির লিখনভঙ্গীও তাঁর দ্বর্জয় সাহস আর ব্বদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কতকগ্বলো পেন্সিলে লেখা কাগজের ট্বকরোর সমষ্টি এই বইখানি—একজন দরদী চেক রক্ষীর সাহায্যে প্রাহার গেস্টাপো বন্দীশালা প্যানক্রাটস থেকে গোপনে বাইরে পাঠানো হয়েছিল। ফ্বচিক আত্মপ্রতারণা ঘৃণা করতেন, তিনি জানতেন এই ধারাবাহিক অনিশ্চিত লেখা তিনি শেষ করে যেতে পারবেন না। কিন্তু তব্ব এই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ছিল যে, তাঁর লাখো লাখো স্বদেশবাসী আর অন্যান্য দেশের ফাশিস্ট-বিরোধীরা লিখবেন তার মধ্বর উপসংহার—হ্যাঁ, তিনি তাই বলেছিলেন।

জনগণ আর তাদের ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস—বইখানির ম্বল উপজীব্য। য্বদ্ধকালীন বন্দীশালা-সাহিত্যের অধিকাংশের মতোই ফাশিস্টবাদের নিষ্ঠ্বরতার এক অবিস্মরণীয় চিত্র এখানে আমরা পাই সত্য, কিন্তু তাছাড়া এমন একজন মান্বষের ছবিও ভেসে ওঠে যে শ্বধ্ব ফাশিস্টবাদের শিকারই নয়, অভিযোক্তা, বিচারক, নৈতিক বিজেতা। "হায়, আজ যে বর্বরতার বীজ উপ্ত হোল, একদিন তার থেকে কেমন ফসল ফলবে!" তিনি চিৎকার করে ঘোষণা করছেন। তিনি একজন সহকর্মীর বর্ণনা দিতে গিয়ে যা বলেছেন, তার সম্বন্ধেও সে-কথা প্রয়োগ না করে পারছি না। 'তিনি সবাইকে ভবিষ্যতের নির্দেশ দিচ্ছেন, আর তার নিজের ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট হয়ে আছে মৃত্যুর দিকে।'

ফ্বচিক গেস্টাপোদের হাতে নিহত হয়েছেন, কিন্তু যে ভবিষ্যতের নির্দেশ তিনি এখানে দিয়ে গেছেন, সে আজ তার স্বদেশ চেকোস্লোভাকিয়ায় জীবন্ত বাস্তব। য্বদ্ধ সম্বন্ধে যত বই সেখানে প্রকাশিত হয়েছে, এই বই খানিই পেয়েছে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা। ফ্বচিক আজ জাতির বীরেন্দ্রদের একজন বলেই প্বজা পাচ্ছেন। হিটলারের পরাজয়ে যে-সব দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল, বলতে গেলে তার সব দেশেই বইখানি অন্বদিত হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স আর য্বগোস্লাভিয়ায় তো বটেই। সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে ফ্বচিক একদা একখানা বই লিখেছিলেন। তার নাম "আগামী কাল যেদেশে গত হয়ে গেছে।" বর্তমান এই বইখানিতে তিনি যে ভবিষ্যতের কথা

লিখেছিলেন,, আজ তা র‍ূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে চেকোস্লোভাকিয়ায় এবং ইওরোপের অন্যান্য নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে।

সাংবাদিক, সাহিত্য-সমালোচক, কমিউনিস্ট নেতা জ্বলিয়াস ফ্বচিক ১৯০৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রাহা-স্মিচভ-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ইস্পাতের কারখানায় কাজ করতেন, তাছাড়া ছিলেন সৌখিন অভিনেতা ও গায়ক। ফ্বচিক নিজে শ্রমিক আন্দোলনে আর চেকোস্লোভাকিয়ার সংস্কৃতির জগতে কাজ স্বর্ব করেছিলেন তাঁর কিশোর বয়েস থেকে। প্রাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে সাহিত্য, সংগীত এবং শিল্পশাস্ত্র তিনি পড়েছিলেন। জীবিকা অর্জনে তিনি ছিলেন শ্রমিক, তাই কমিউনিস্ট পার্টিতে এসে গেলেন। সোশালিস্ট পত্রিকাগ্বলিতে তিনি লিখতেন। কিছ্বদিনের ভিতরেই কমিউনিস্ট ছাত্র সংঘের তিনি একজন নেতা হয়ে উঠলেন। ১৯২৯ সালে ভোর্বা (স্ৃষ্টি)-র প্রধান সম্পাদক হলেন, পত্রখানি তাঁরই সম্পাদনায় সংস্কৃতি আর রাজনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারপরে তিনি হলেন চেক কমিউনিস্ট পার্টির ম্বখপত্র 'র্বদে প্রভো'র সম্পাদক।

দ্ববার তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নে যান এবং তাঁর সেই অভিজ্ঞতা দেশবাসীকে খবরের কাগজের বার্তাপ্রেরক, বক্তা এবং সম্পাদক হিসেবে জানান। এবং তারই ফলে ফ্বচিক নিগৃহীতও হলেন, চেক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বার বার তাঁকে বন্দী করল। মিউনিক অধ্যায়ে কমিউনিস্ট কাগজ বে-আইনী হয়ে গেল, পার্টি চলে গেল অন্তরালে। নাৎসী অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ফ্বচিক আত্মগোপন করলেন। তিনি মার্ক্সবাদী সাহিত্য এবং ইতিহাস পঠনে মনোনিবেশ করলেন, আবার পার্টির প্রধান ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণও তখন তাঁর হাতে। সহকর্মীদের সঙ্গে মিলে তিনি গোপন আন্দোলনের ম্বখপত্র 'র্বদে প্রাভো' প্রকাশ করলেন (তিনি ছিলেন সম্পাদক)। তাছাড়া আরও বই বের্বল, তার মধ্যে বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা 'ত্রানাভেসেক' (খ্বদে বাঁশী)ও ছিল।

চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে ফ্বচিক তাঁর এই বই খানিতে শ্রদ্ধা আর গর্ব ভরে লিখেছেন। এই পার্টিই আজ সে দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ। বর্বরোচিত নির্যাতন সহ্য করেও এই পার্টি সেদিন প্রমাণ করেছিল যে, সে চেক শ্রমিক আর সমস্ত জাতির অবিনাশী অংশবিশেষ। আজ যখন প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীরা আমেরিকায় চেকোস্লোভাকিয়ার মিউনিকদলের মতো আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী দলকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চাইছে, তখন ফ্বচিকের বইখানি আমাদের বিশেষ শিক্ষাই দেবে। এখানে আমরা কমিউনিস্টদের সত্য স্বর্‌প দেখতে পাই, জনস্বার্থের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রক্ষক তারা। আমরা জানতে পারি সোশালিজমের দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে সত্যিকারের বন্ধ্বত্বই যে কোনো জাতিকে প্রতিক্রিয়াশীলতা আর ফাশিস্টবাদের

হাত থেকে বাঁচাবার একমাত্র উপায়। শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক, চেক শ্রমিক শ্রেণীর সত্যিকারের সন্তান হিসেবেই ফ্যুচিক সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্বন্ধে তাঁর ভালবাসা আর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

গেস্টাপোদের হাতে তিনি ধরা পড়েন, নির্যাতিত ও নিহত হন। তখন তাঁর বয়েস চল্লিশ। এমন চমৎকার কষ্টকল্পনাহীন, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি-সম্পন্ন, জীবনের প্রতি ভালোবাসায় সমৃদ্ধ এই কয়েকখানি পাতায় ফ্যুচিক রেখে গেছেন সাহিত্যে তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। আর রেখে গেছেন স্মরণীয় উপদেশ—তার শেষ লাইনটি যেন আমরা মনে রাখি 'হুশিয়ার'! 'বাস্তবে' তো তিনি লিখেছেন, 'দর্শক নেই, সবাই তোমরা সেখানে অংশ গ্রহণ করছ।' যেমন জীবন সম্বন্ধে তেমনি প্রকৃত সাহিত্য সম্বন্ধেও কি একথা সত্য নয়? যে যুদ্ধ চলছে, চলবে এই বইখানি সেখানে নিচ্ছে বা নেবে এক মহান ভূমিকা—আজ সে যুদ্ধ আমাদের ঘরের কত কাছে এসে পড়েছে।—আর সে যুদ্ধ তো ফাশিস্টবাদের অমানুষিক বর্বরতার বিরুদ্ধে।

স্যামুয়েল সিলেন

২
একটু লেখা

রাভেনসব্রুকের বন্দীশালায় আমারই এক বন্দী সাথীর কাছ থেকে শুনেছিলাম, আমার স্বামী জুলিয়াস ফুচিক বার্লিনের এক নাৎসী আদালতে ১৯৪৩ সালের ২৫শে অগস্ট প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

তাঁর অদৃষ্টে পরে কি ঘটল সে প্রশ্ন শুধু বন্দীশিবিরের চারদিক ঘেরা উঁচু দেয়ালে তুলেছে প্রতিধ্বনি।

১৯৪৫ সালের মে মাসে হিটলার-জার্মানীর পরাজয় হলো। যে সব বন্দীদের ফাশিস্টরা নির্যাতনে নির্যাতনে তখনো মেরে ফেলতে পারে নি, তারা পেল মুক্তি। আমি তাদেরই একজন।

আমার মুক্ত স্বদেশে ফিরে এসে স্বামীর খোঁজ করলাম। এমনি হাজার হাজার মানুষ তাদের স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, পিতা-মাতার খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল। বিজেতা জার্মানের অসংখ্য নির্যাতনের নরকে এরা সব ছিল বন্দী।

শুনলাম, ১৯৪৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর, তাঁর দণ্ডাদেশ হবার চৌদ্দ দিন পরে তাঁকে হত্যা করা হয়।

একথাও জানলাম যে প্রাহার প্যানক্রাটস্ বন্দীশালায় জুলিয়াস ফুচিক কিছু লিখেছিলেন। কোলিনস্কী নামে একজন চেক রক্ষী, কাগজ আর পেন্সিল তাঁর সেলে এনে দিয়েছিল, তারপর সে-ই গোপনে এক একখানা করে কাগজ নিয়ে যেত বাইরে। আমি সেই রক্ষীটির সঙ্গে দেখা করে আমার স্বামী প্যানক্রাট্স্-এ বসে যা কিছু লিখেছিলেন সংগ্রহ করলাম। বহু বিশ্বস্ত মানুষের সঙ্গে থেকে তিনি যে কয়েকখানি পাতা লিখেছিলেন—আজ পাঠককে তাই-ই দিলাম উপহার—এই জুলিয়াস ফুচিকের জীবনের সৃষ্টির শেষ অধ্যায়।

—অগাস্তিনা ফুচিক

৩

ফাঁসীর মঞ্চ থেকে

জুলিয়াস ফুচিক জাতিতে চেক। পেশাদার সাংবাদিক আর কবি ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর আগে, তিনি যা দেখেছিলেন আর ভেবেছিলেন তাই লিখে গেছেন। স্বদেশকে ভালবাসার পাপে নাৎসীরা তাঁকে হত্যা করল। তিনি তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর এই মূল্যবান আর প্রিয় শিল্প নিয়েই ছিলেন, তাই তিনি এই মহামূল্য দলিল দিয়ে গেছেন আমাদের। যারা গেস্টাপো দ্বারা ধৃত হয়েছিল তারা কি দেখলো, কত উৎপীড়ন সহ্য করল তারই বিবরণ এইখানি।

অন্তিম মুহূর্তের এই মহৎ সৃষ্টির উপযুক্ত শক্তি তাঁর ছিল। একজন সৃজনী শিল্পী তিনি, সারা দেশ তাঁকে জানত, ভালবাসত। তাছাড়া তিনি ছিলেন রাজনীতিক দলের নেতা, চেক কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্য। ১৯৪২ সালে গেস্টাপোর হাতে তিনি ধরা পড়েন।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে, একজন রক্ষী তাঁকে কৌশলে কাগজ আর পেন্সিল পৌঁছে দিল। রক্ষীটি জন-আন্দোলনের এক সভ্য। এরই মধ্যে ফুচিকের উপর নির্মম নির্যাতন চলে, তাঁর আত্মার চরম পরীক্ষা তখন শেষ।

তাই, তারপর বছর খানেক ধরে ফুচিক টুকরো টুকরো লেখা লিখলেন—সেগুলি তাঁর মেয়াদের অভিজ্ঞতার অসংলগ্ন অথচ চমৎকার বিবরণ।

ফলে এক অপূর্ব, অনুপ্রেরণাময়, আর ভীতিপ্রদ পরিচয় পেলাম মানুষের—এ সেই মানুষ যার উপর দিয়ে হয়ে গেছে চরম পরীক্ষা। অজ্ঞানতা, ভীতি আর অন্ধসংস্কার থেকে মুক্ত মানবআত্মার মূল্য নির্ধারণের এ এক দলিল। কমিউনিস্ট পার্টি আর মানব সমাজের মধ্যে এ এক পবিত্র অঙ্গীকার।...

তাঁর রচনা কৌশল ভালো কি মন্দ, কথা আজ তা নিয়ে নয়, কথা হচ্ছে, তিনি তাঁর মতো হাজারো মানুষের সাহস আর স্বার্থহীনতা মূর্ত করে তুলেছেন—আর তা তিনি করতে সক্ষম হলেন ভালবাসা, সহানুভূতি আর জীবনের ধারার প্রতি এমন বিশ্বাস নিয়ে—ছাপার হরফে যার উদাহরণ বিরল।

তাই আজকের ইওরোপে জুলিয়াস ফুচিকের এই লেখা যেন ঘণ্টাধ্বনির মতোই মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে বাজছে। তাই পৃথিবীর

যে কোনো বর্ণের, যে কোনো জাতির মানুষ পড়ছে ফুচিক, তার অসীম সাহস আর প্রশান্তি থেকে তারা নতুন উদ্দীপনা পাচ্ছে।

আমার মনে হয়, ফুচিক জানতেন এমনি একটা কিছু ঘটবে। লেখক হিসেবে তাঁর শব্দের প্রতি মমতা বুঝতে পারি, বুঝতে পারি তাঁর লিখিত প্রমাণের ন্যায় আর গাম্ভীর্যের প্রতি বিশ্বাস। প্রতি শব্দে তাঁর জীবনের কামনা ঝরে পড়ছে, ঝরে পড়ছে সাথীদের প্রতি ভালোবাসা, সুন্দর প্রাহার প্রতি শ্রদ্ধা, আর কমিউনিস্ট হিসেবে তাঁর কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা।

নিজেকে অমর করবার জন্য লিখলেন তিনি, তাঁর ভালবাসা, তাঁর কাজ যাতে শেষ না হয়ে যায়, চলতে থাকে—তারই জন্য তিনি লিখলেন। যাতে তার হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বন্ধ হবার পরেও তিনি আজাদীর সংগ্রামের যোদ্ধা আর কমিউনিস্ট হতে পারেন তারই জন্য লিখলেন তিনি।

'অচেতন সৃষ্টি'র দলে তিনি ছিলেন না। প্রতিটি শব্দকে তিনি অস্ত্রের রূপ দিয়ে পাঠালেন, তাদের যা করবার শক্তি তারা করুক। তার বইয়ে আত্মকরুণা, সস্তা ভাবালুতা আর কৃত্রিম ভাবাবেগের চিহ্ন নেই। তার গদ্য যেন পুরুষের মতো—তেমনি গর্বিত উন্নত শির, নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ।

হাজার হাজার কমিউনিস্টের মতো জুলিয়াস ফুচিক মানুষের মুক্তির জন্য জীবন দিলেন। তাদের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের দিক থেকেই তাঁর প্রভেদ—এই কথা তিনি বলেছেন। তাঁর শেষ সাক্ষ্য রেখে যেতে তিনি সক্ষম হলেনঃ অন্য সবাই জীবন দিল নামহীন নিঃশব্দভাবে, তাদের হয়ে বললেন তিনি।

* * *

এই পরিস্থিতিতে ফুচিকের বইখানির বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা করতে পারছি না, আমি শুধু তার হাত—তার মৃত্যুবলে বলিয়ান হাত ধরে তাকে ধন্যবাদ জানাতে পারি। তিনি জীবিতদের হাতে এই পৃথিবীকে সঁপে দিয়ে গেছেন, আর দিয়ে গেছেন এক লড়াইয়ের উত্তরাধিকার—সে লড়বার মতো লড়াই বটে। তার নিজের উইলে তিনি লিখে গেছেনঃ

এই শেষ লড়াইয়ে যারা বাঁচবে তাদের প্রতিজনের করমর্দন করছি, আমাদের পরে যারা আসছে তাদেরও হাত চেপে ধরছি। গাস্তিনা আর আমার হাত মুঠোয় চেপে ধরোঃ আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি।

আবার বলছি, আমরা পৃথিবীর সুখের জন্য বেঁচে ছিলাম, তারই জন্য লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, তারই জন্য হলো আমাদের মৃত্যু। আমাদের নামের সঙ্গে যেন দুঃখ না জড়িয়ে থাকে।

হাওয়ার্ড ফাস্ট

ভূমিকা

পেটচেক ব্যাংকের আগেকার বাড়িটার এক ঘরে 'তৈরী হবার' ভঙ্গীতে, শরীরকে একেবারে সিধে করে হাঁটু দুটো দুহাতে চেপে সামনের ফ্যাকাশে মেরে আসা দেয়ালটার দিকে চেয়ে বসে থাকা—আর যা-ই হোক, ভাবরাজ্যে তলিয়ে যাবার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত জায়গা নয়। কিন্তু মনকে এমনি ভঙ্গীতে বসিয়ে রাখে কার সাধ্য?

কে কবে পেটচেক বিল্ডিংয়ের এই হলঘরটার 'ছবিঘর' নাম দিয়েছিল, জানি না—জানতেও পারব না। জার্মানরা একে বলত—ঘরোয়া ফাটক, কিন্তু 'ছবিঘর' নামটা প্রতিভারই চমক বলতে হবে। প্রশস্ত হলে ছ'সার বেঞ্চ, যাদের তদন্তের জন্য আনা হয়েছে তারা সেগুলি জুড়ে বসেছে—নড়াচড়া নেই। তাদের চোখের সুমুখের ফাঁকা দেয়াল যেন পর্দা, শুনানি, নির্যাতন আর মৃত্যুর প্রতীক্ষায় এখানে বসে বসে তারা পর্দার উপর নিক্ষেপ করছে দৃশ্যের পর দৃশ্য—এত দৃশ্য কোনো চলচ্চিত্রেও বুঝি তোলা হয়নি। একজনের গোটা জীবনের চিত্র, অথবা ছোটখাটো মুহূর্তের ছবি, মা, স্ত্রী, সন্তান, ধ্বংসীভূত গৃহ আর জীবনের সাহসী সঙ্গীর ছবি—অথবা বিশ্বাসঘাতকতার ছবি। যাকে আমি নাৎসীবিরোধী ইশ্‌তেহার দিয়েছিলাম সেই মানুষটির ছবি, যে রক্ত আবার ঝরল, যে হাত চির বিশ্বস্ততায় আমার হাত দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরল—তারই ছবি। ভয়াল, আর দৃঢ় সঙ্কল্পময় মুহূর্ত, ঘৃণা; ভালবাসা, ভয় আর আশার সে ছবি। জীবনের দিকে পিছন ফিরে আমরা বসে থাকতাম, প্রতিদিন আমরা প্রতিটি মানুষ নিজেদের চোখের সুমুখে মরে যেতাম। কিন্তু সবার তো পুনর্জন্ম হোল না।

জীবনের চলচ্চিত্র এমনি কত-শতবার দেখেছি। হাজারো ঘটনা তার। এবার বসব লিখতে।

শেষ হবার আগেই যদি জল্লাদের ফাঁস আমার শ্বাস রোধ করে দেয়, তবে লাখো লাখো মানুষ রইলো যারা লিখবে তার 'মধুর উপসংহার'।

জে. এফ.

প্রাহার প্যানক্রাটস্‌-এর গেস্টাপো
বন্দীশালায় ১৯৪৩ সালের
'বসন্তে' লিখিত।

ফাঁসীর মঞ্চ থেকে

এক

চব্বিশ ঘণ্টা

আর পাঁচ মিনিটের ভিতরেই ঘড়িতে বাজবে দশটা। সুন্দর, উষ্ণ বাসন্তী সন্ধ্যা। ২৪শে এপ্রিল, ১৯৪২ সাল।

বয়স্ক খোঁড়া লোকের ভান করে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি চলেছি। জেলিনেকদের ওখানে যেতে হবে। দশটায় সান্ধ্য আইন শুরু, বাড়ির ফটক যাবে বন্ধ হয়ে। সেখানে আমার 'সহকারী' মিরেক অপেক্ষা করছে। এবার সে জরুরী সংবাদ দেবে না তা জানি, আমারও তেমন কিছু বলবার নেই। কিন্তু সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট হয়েছে, এখন দেখা করতে না গেলে ওরা ভয় পাবে। যাদের বাড়ি যাচ্ছি, সেই দম্পতিকে আর উদ্বিগ্ন করতে রাজি নই। ওরা চমৎকার লোক।

এক পেয়ালা চা দিয়ে ওরা আমাকে অভ্যর্থনা করল। মিরেকও আছে আর আছে ফ্রিড্-দম্পতি। এ এক অনাবশ্যক বিপদ সৃষ্টি।

কমরেড, আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই বটে, কিন্তু এমনিভাবে একসঙ্গে নয়। একঘরে এত লোক জড়ো হবার মানে জেল আর মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করা। হয় আপনারা গোপন আন্দোলনের আইন-কানুন মেনে চলবেন, নয় আমাদের সঙ্গে কাজ করা ছেড়ে দিন। আপনারা নিজেদের তো বিপন্ন করছেনই, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বিপন্ন হচ্ছি। বুঝতে পারলেন তো?

হাঁ বুঝেছি।

কি এনেছেন?

রেড রাইটস্-এর পয়লা মে সংখ্যার জন্য এই লেখা।

বেশ বেশ। মিরকো তুমি?

নতুন কিছু নেই। কাজ ভালই চলছে...।

এই! পয়লা মের পরে আবার দেখা হবে। খবর পাঠাব। আচ্ছা, এবার আসি।

কমরেড, আর এক পেয়ালা চা।

না, না মিসেস জেলিনেক। এখানে আমরা বহুলোক জড়ো হয়েছি। আজ আর দেরি করব না।

আর এক পেয়ালা দিই না।

সদ্যঢালা চা থেকে উঠছে ধোঁয়া।

কে যেন ঘণ্টা বাজাচ্ছে বাইরের দরজায়।

এত রাত্রে? লোকটা কে?

অসহিষ্ণু অতিথি। দরজায় ধাক্কা মারছে।

দরজা খোল। পুলিস!

তাড়াতাড়ি জানালা টপকে পালান যায় বটে। আমার কাছে পিস্তল আছে। ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারব। না, দেরী হয়ে গেছে। গেস্টাপোরা জানালার নীচে দাঁড়িয়ে ঘর লক্ষ্য করে পিস্তল উঁচিয়ে আছে। গোয়েন্দারা দরজা ভেঙে রান্নার ঘরের ভিতর দিয়ে ছুটে আসছে ঘরের দিকে। এক, দুই, তিন—ন'জন হবে। আমাকে ওরা দেখতে পায়নি। যে দরজা দিয়ে ওরা ঢুকল তারই পিছনে আমি। ওদের পিঠে গুলি ছুঁড়তে পারি কিন্তু ঘরে দুটি স্ত্রীলোক আর তিনটি নিরস্ত্র পুরুষ। ন'টি পিস্তল তাদের দিকে উদ্যত। গুলি ছোঁড়বার আগেই আমার পাঁচটি বন্ধু লুটিয়ে পড়বে। যদি নিজেকে গুলী করি, তাহলেও ওরা গুলী ছুঁড়বেই। ঐ পাঁচজন মরবেই। আর গুলী না ছুঁড়লে, ওরা ছ'মাস কি এক বছর জেলে থাকবে, তারপর বিপ্লব এসে ওদের দেবে মুক্তি। জীবন্তই ওরা বেরিয়ে আসবে। শুধু বের হব না আমি আর মিরেক। ওরা আমাদের উপর চালাবে উৎপীড়ন। আমার কাছে থেকে কোন কথাই বার কর্‌তে পারবে না, কিন্তু মিরেকের কাছ থেকে? যে স্পেনে লড়াই করেছে, ছ-বছর যে ফ্রান্সের বন্দীশিবিরে কাটিয়ে এল, যে গোপনে যুদ্ধের ভিতরে ফ্রান্স থেকে এল প্রাহায়—না, না, সে কিছু বলবে না, বলতে পারে না। আর দু'সেকেণ্ড আছে ভাববার। না, তিন সেকেণ্ড?

যদি গুলী ছুঁড়ি কাউকে বাঁচাতে তো পারব না, শুধু নিজে রেহাই পাব নির্যাতন থেকে—কিন্তু আমার পাঁচটি বন্ধুর প্রাণ বলি দিতে হবে। সত্যি তো? হাঁ।

সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম। কোণ থেকে এলাম বেরিয়ে।

এই যে আর একজন!

প্রথম আঘাত পড়ল মুখে। একজন লোককে পেড়ে ফেলবার পক্ষে যথেষ্ট।

হাত তোল।

আবার ঘুষি, আবার।

যা ভেবেছিলাম, ঠিক মিলে যাচ্ছে।

সাজানো-গোছানো ঘরখানা এখন আসবাবপত্র আর ভাঙা জিনিসের স্তূপ। আরও ঘুষি আর লাথি।

চল, মার্চ করে চল।

ওরা আমাকে টেনে হিঁচড়ে এনে তুলল একখানা গাড়িতে। পিস্তল সারাক্ষণ রইল আমার দিকে উঁচিয়ে। গাড়িতে বসেই সুরু হোল।

তুমি কে?

অধ্যাপক হোরাক।

মিছে কথা বলছ।

ঘাড় নাড়লাম।

চুপ করে বসে থাক, নড়লেই গুলী করব!

বেশ, তাই কর।

গুলী নয়, তার বদলে ঘুষি চালাল আবার।

পথে একটা গাড়ীর পাশ দিয়ে চলে এলাম আমরা। মনে হচ্ছে, গাড়ীটির যেন সাদা সজ্জা। বিয়ের গাড়ী এত রাতে? নিশ্চয়ই জ্বরের ঘোরে দেখছি।

পের্টচেক বিল্ডিং, গেস্টাপোর প্রধান ঘাঁটি। কখনো ভাবিনি, জ্যান্ত অবস্থায় এখানে ঢুকব। ওরা আমাকে পাঁচতলা অবধি দৌড় করিয়ে ছাড়ল। এই সেই বিখ্যাত বা কুখ্যাত দুই-ক বিভাগ, কমিউনিস্টবিরোধী তদন্ত আফিস। আমি কেমন কৌতুহলী হয়ে উঠেছি।

গ্রেফতারি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রোগা ঢেঙা কমিসার পকেটে একটা রিভলবার পুরে আমাকে তার অফিসে নিয়ে গেল। আমার সিগারেট দিল ধরিয়ে।

তুমি কে?

অধ্যাপক হোরাক।

মিছে কথা বলছ।

তার হাত-ঘড়ীতে এখন এগারোটা।

ওকে তল্লাশ কর!

ওরা ল্যাংটো করে তল্লাস করল।

একখানা পরিচয়-পত্র পাওয়া গেছে।

নাম?

অধ্যাপক হোরাক।

খোঁজ নাও।

ওরা ফোন করলে।

না, রেজিস্টারি করা নেই। জাল পরিচয়-পত্র।

কে দিয়েছে এ পরিচয়-পত্র বল?

পুলিসের প্রধান ঘাঁটি থেকে।

এবার লাঠির প্রথম বাড়ি পড়ল। দ্বিতীয়, তৃতীয়... গুণব নাকি? কি হবে। কোথায় জানাব তার বিবরণ?

নাম কি? বল। ধাম? বল। কার সঙ্গে যোগসাজস আছে? জবাব দাও। তাদের নামধাম কি? বল! বল! বল, না হলে পিটিয়ে মেরে ফেলব তোমাকে।

কত মার মানুষ সহ্য করতে পারে?

বেতারযন্ত্রে চিৎকার করে ঘোষণা করল দুপুর রাত্রি। কাফেগুলো বোধহয় সব বন্ধ হয়ে এল। শেষ অতিথিরা ফিরছে বাড়ি। প্রেমিক-প্রেমিকা বাড়ির দরজায়, বিদায় নিতে মন চাইছে না। এবার ঘরে এল রোগা ঢেঙা কমিসার, মুখে তার হাসি।

কোনো কিছুর ত্রুটি হয়নি—সব ঠিক আছে তো সম্পাদক?

কে বললে ওকথা? জেলিনেকেরা? ফ্রিডরা? না, না, তারা তো আমার নামও জানে না।

দেখছ তো, আমরা সবই জানি। এবার বল! অবুঝ হয়ো না।

ওদের বিশেষ অভিধানে বুঝদার হওয়া মানে বিশ্বাসঘাতকতা।

তাই বুঝদার আমি হব না।

বেঁধে আর কয়েক ঘা লাগাও।

একটা। শেষ গাড়িগুলো ফিরে যাচ্ছে, পথ জনশূন্য। বেতার তার শেষ বিশ্বস্ত শ্রোতাদের কাছে বিদায় নিচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সমিতির আর আর সভ্য কারা? তোমাদের ট্রান্সমিটারগুলো কোথায়? কোথায় ছাপাখানা? বল! বল! বল!

এখন আমি গুণতে পারছি আঘাতগুলো। ব্যাথা শুধু এখন ঠোঁটে। ঠোঁট কামড়ে রয়েছি তাই।

ওর জুতো খুলে ফেল।

সত্যি, আমার পাটাকে এখনও মেরে মেরে অবশ করে ফেলতে পারে নি। হাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। পাঁচ, ছয়, সাত... লাঠির ঘা যেন মগজে গিয়ে লাগছে প্রতিবার।

দুটো। প্রাহা নিদ্রামগ্ন। কোথায় হয়তো শিশু কেঁদে উঠল, কোথাও বা কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর নিতম্বে মৃদু চাপড় মারছে।

বল! বল!

রক্তাক্ত মাড়ি অনুভব করছি জিভ দিয়ে, গুণতে চেষ্টা করছি ক'টা দাঁত ওরা উপড়ে ফেলে দিয়েছে। গুণতে ঠিক পারছি না। বারো, পনেরো, সতেরো? না, সেতো ক'জন কমিসার আমার জবানবন্দী নিয়েছে তারই

হিসেব। কেউ কেউ বেশ ক্লান্ত হয়েই পড়েছে। কিন্তু তবু তো মৃত্যু এল না!

তিনটে। শহরতলী থেকে ভোর ভেসে আসছে। ট্রাক চলেছে বাজারের দিকে, ঝাড়ুদার কাজে বেরিয়েছে। হয় তো, আর একটি ভোর দেখতে পাব।

ওরা আমার স্ত্রীকে নিয়ে এল।

ওকে চেন?

ও যাতে দেখতে না পায়, তাই মুখের ভিতরে জমে ওঠা রক্ত গিলে ফেললাম। ...কিন্তু এতো বোকামী, আমার মুখের সব জায়গা দিয়ে ঝরছে রক্ত, হাতের আঙুলের ডগায় রক্ত।

—ওকে চেন?

—না, চিনি না।

সে বলল। দৃষ্টিতেও তার ভয়ের চিহ্ন নেই। খাঁটি সোনা। প্রতিশ্রুতি রেখেছে, আমাকে চিনবে না। যদিও এখন আর কোনো প্রয়োজন নেই। কে, কে ওদের বলল আমার নাম?

ওকে নিয়ে গেল। আমি যথাসম্ভব প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়ে ওকে জানালাম বিদায় সম্ভাষণ। হয়ত প্রসন্নতা তাতে ছিল না। কিন্তু আমি তো জান্‌তে পারিনি।

চারটে। ভোর হয়ে এল, না এখনও হয় নি? অন্ধকার, বন্ধ জানালা তো সে উত্তর দেবে না। মৃত্যু আসতে দেরি করছে। আমি এগিয়ে যাব ওর সঙ্গে দেখা করতে? কিন্তু কেমন করে যাব?

কাকে যেন পালটা আঘাত করলাম। মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছি। ওরা লাথি মারছে। বুট দিয়ে মাড়াচ্ছে। এই তো, তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাব। শয়তান কমিসারটা আমাকে দাড়ি ধরে টেনে তুলে দেখাল একহাত ভর্তি ওপড়ানো দাড়ি। মুখে তার শয়তানি হাসি। সত্যিই হাসির ব্যাপার। আর তো ব্যথা পাচ্ছি না।

পাঁচটা—ছটা—সাতটা—দশটা। এখন দুপুর, শ্রমিকরা তাদের কাজে গেছে, ছেলেমেয়েরা স্কুলে। দোকানে দোকানে চলছে বেচাকেনা। বাড়িতে সবাই খাচ্ছে দুপুরের খাবার। হয় তো মা এই মুহূর্তে আমার কথাই ভাবছেন। হয় তো আমার সঙ্গীরাও জেনে গেছে আমি ধরা পড়েছি। নিজেরা যাতে ধরা না পড়ে তাই সাবধান্ হয়েছে। ... যদি ফাঁস করে দিই সব—কি হবে... না, না কখনও না, আমাকে বিশ্বাস করতে পার, হাঁ সত্যি পার। সে যাহোক, শেষ আর বেশী দূরে নয়। সে এক দুস্বপ্ন, এক ভয়ংকর জ্বরার্ত দুঃস্বপ্ন। আঘাতের পর আঘাত, তারপর আমার চেতনা ফিরিয়ে আনবার জন্য জল ঢেলে দিল। আবার আঘাত আর চিৎকার। বল!

বল! বল! কিন্তু তবু তো মরছি না। মা, বাবা, এত সহ্য করবার শক্তি কেন দিয়েছিলে?

বিকেল। পাঁচটা। এখন সবাই ক্লান্ত। আঘাতে প্রচণ্ডতা নেই, ধীরে ধীরে পড়ছে, দেখা দিচ্ছে দীর্ঘ বিরাম। এসেছে অবসাদ। হঠাৎ দূর—বহুদূর থেকে শান্তস্বরে যেন ভেসে এল, স্বর তো নয় পিঠ-চাপড়ানিঃ

—যথেষ্ট হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই একটা টেবিলের সুমুখে বসলাম। টেবিলটা যেন সরে যাচ্ছে আবার ফিরে ফিরে আসছে। কে একজন একটা সিগারেট দিলে, তুলতেও পারছি না। কে যেন আমাকে চটি পরাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। এবার ওরা আমাকে খানিকটা ধরে, খানিকটা টেনে সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলল। গাড়ি চলছে, একজন পিস্তল হাতে আমাকে পাহারা দিচ্ছে। আমার এমনি অবস্থায় পিস্তল! হাসি পায়। একটা গাড়ি চলে গেল পাশ দিয়ে। সাদা ফুলে সাজানো, বিয়ের গাড়ি—হয়তো এ আমার স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়। হয় স্বপ্ন, নয় তো জ্বরের ঘোর, নয়তো আমি মুমূর্ষু—হয়তো বা মৃত্যুই ঘনিয়ে এল। মুমূর্ষু অবস্থাই তো কঠিন, কিন্তু সে তো সহজ—অথবা সহজ বা কঠিন কোনোটাই বুঝি নয়। যেন সোলার মত হালকা, নিঃশ্বাসেই উড়ে যাবে।

সবাই গেছে? না এখনও যায়নি। আবার উঠে দাঁড়িয়েছি, হ্যাঁ, একাই, কোনো অবলম্বন না নিয়ে। আমার সুমুখে নোংরা হলদে দেয়াল। ছিটিয়ে পড়েছে...কি, কি ছিটিয়ে পড়ল? রক্ত, হ্যাঁ, তাইতো রক্তই তো। একটা আঙুল তুলে সেই রক্ত মাখছি আঙুলে...হাঁ, তাজা রক্ত...আমারই রক্ত...।

পিছন থেকে কে যেন মাথায় আঘাত করল। আমাকে দু-হাত তুলতে বলছে, হাঁটু গেড়ে বসতে হুকুম দিচ্ছে। ওঠ-বস-ওঠ তিনবারের বার পড়ে গেলাম।

একজন ঢেঙা এস্-এস্-এর লোক দাঁড়িয়ে আছে আমার সুমুখে। ওঠবার জন্য লাথি মারছে। লাথি মারা তো এখন নিরর্থক। আর একজন আমার মুখ ধুইয়ে দিল। একটা টেবিলের ধারে বসেছি। একটি স্ত্রীলোক ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছে, জিজ্ঞেস করছে, কোথায় ব্যথা। বললাম, সব ব্যথা বুঝি আমার হৃদয়ে।

—তোমার হৃদয় বলে কিছু নেই। ঢেঙা এস্-এস্-এর লোকটি বলল।

আছে বই কি, বললাম। হঠাৎ গর্বে মন ভরে গেল। এখনো হৃদয়ের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়াবার মতো শক্তি আছে দেখছি।

আবার সব মিলিয়ে গেল—দেয়াল, স্ত্রীলোক, ঢেঙা এস্-এস্—সব।

যখন চেতনা ফিরে এল, দেখি একটা সেলের দরজা খুলে গেছে। একজন মোটাসোটা এস্‌-এস্‌ আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভিতরে, আমার ছেঁড়া খোড়া সার্টটা টেনে খুলে ফেলছে। এবার আমাকে খড়ের গদির উপর শুইয়ে দিল। হাত দিয়ে টিপে দেখল আমার ফুলে-ওঠা শরীর, তারপর সেঁক দেবার হুকুম দিল।

—দেখ, দেখ। অন্য একটি লোককে মাথা নেড়ে বলল, ওরা কেমন নিখুঁত কাজ করে দেখ।

আবার দূর বহুদূর থেকে ভেসে এল সেই শান্ত সংযত স্বর, পিঠ চাপড়ানির মতোঃ

—ভোর পর্যন্ত টিকবে না।

আর পাঁচ মিনিট পরেই বাজবে দশটা। দশটা বাজবে—সুন্দর, উষ্ণ বাসন্তী সন্ধ্যায়, ২৫শে এপ্রিল ১৯৪২ সালে।

দুই

মুমূর্ষু

সূর্যের তাপ আর তারার আলো চিরতরে নিবে যায় গো মিলিয়ে যায়…

দু'জন লোক। একজনের পিছনে আর একজন। বারবার এক সাদা দেয়ালওয়ালা গির্জার উপাসনা মন্দিরের ভিতর ঘুরছে। হাত জোড় করে প্রার্থনা করছে। গলা তাদের সাধা নয়, তবু গাইছে এক শোক গাথা, টেনে টেনে গেয়ে চলছে :

ঘন আনন্দে আত্মা মেলেছে পাখা
ঊর্ধ্ব স্বর্গে যাত্রা শুরু যে তাহার যাত্রা।…

কেউ মারা গেছে। কে? আমি পিছন ফিরে শবাধার আর শব দুই-ই দেখতে চেষ্টা করলাম, দুটো মোম জ্বলছে তারই শিয়রে ঊর্ধ্ব শিখায়।

চিরতরে যেথা রাত্রির অবসান
চির ভাস্বর দিবার জ্যোতিতে।…

এখন চোখ তুলে এদিকে ওদিকে তাকাতে পারি। এখানে আর কেউ নেই। দু'জন ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না—আর আমি। কার জন্য ওরা গাইছে শোকগাথা?

যেথা জ্বলে তারা আকাশে অনির্বাণ
যীশু সেইজন—তিনিই স্বয়ং যীশু।…

অন্ত্যেষ্টি—হাঁ অন্ত্যেষ্টিই বটে—কিন্তু কাকে ওরা কবর দিচ্ছে? দেখি তো আর কে আছে—শুধু ওরা দু-জন আর আমি। আর আমি? তা হলে এ আমারই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া? কিন্তু শোন তোমরা, কিছু একটা ভুল হয়েছে। আমি মৃত নই। এখনো বেঁচে আছি। দেখছ না তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছি, কথা কইছি? থাম। এখুনি আমাকে কবর দিও না!

আমাদের ছেড়ে মহাপ্রয়াণের পথে
কোনজন কবে শেষের বিদায় মাগে।…

ওরা শুনছে না। কালা নাকি? আরও জোরে বলতে হবে? না, সত্যিই মরে গেছি? তারা হয় তো অশরীরীর স্বর শুনতে পাচ্ছে না?

আমার দেহটা কি এমনি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব আমার শেষকৃত্য? ভারি হাসির ব্যাপার বই কি।

দু-নয়ন তার আকুল আগ্রহে
ঊর্ধ্ব স্বর্গে ছুটে ছুটে শুধু যায়।...

এখন মনে পড়ছে। কে যেন আমাকে তুলে ধরে পোশাক পরাবার চেষ্টা করছিল। তারপর শবাচ্ছাদনী ঢেকে আমাকে নিয়ে চলল, ওদের পায়ের পেরেক লাগানো জুতোর শব্দ বেজে উঠছিল বারান্দায়। তারপর...এই তো সব। আর তো মনে নেই।

...যেথা জ্বলে সেই চির শাশ্বত আলো।

কিন্তু এ তো হতেই পারে না। আমি এখনও অস্পষ্ট ব্যথা আর তৃষ্ণা অনুভব করছি, মৃতেরা তো তৃষ্ণার্ত হয় না। দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে হাতখানা তুলতে চাইলাম। এক অদ্ভুত, অস্বাভাবিক স্বর বেরিয়ে এল গলা থেকে।

জল!

হাঁ, অবশেষে! লোক দুজন তাদের পরিক্রমা থামাল। আমার উপর ঝুঁকে পড়েছে, একজন আমার মাথা তুলে আমার ঠোঁটের কাছে ধরল এক জলের পাত্র।

—বাছা, কিছু খাওয়াও তোমার দরকার। দুদিন তো শুধু জলের উপর রয়েছ।

—কি বললে সে? দুদিন এরই মধ্যে হয়ে গেছে? আজ কি বার?

—সোমবার।

সোমবার। শুক্রবার গ্রেফ্‌তার হয়েছিলাম। উঃ মাথাটা কি ভারি। আঃ, জল কি ঠাণ্ডা। ঘুম, ঘুমোতে দাও আমাকে। এক ফোঁটা জল ঝরণার বুকে তুলেছে সাড়া। জানি, প্রান্তরে পাহাড়গুলোর ভিতরে প্রান্তরের মাঝে বনবিভাগের কর্তার বাড়ির কাছে ঠিক ঝরণা আছে, রোকলান পর্বতের নিচেই আছে। তাদের খসে পড়া পাতার ভিতরে তারই হালকা অশ্রান্ত ঝিরঝিরানি গান...ঘুম কি মিষ্টি... আবার যখন জাগলাম তখন মঙ্গলবারের সন্ধ্যা, একটা রোগা কুকুর ঝুঁকে পড়েছে আমার উপর। একটা নেকড়ে-শিকারী কুকুর। সে তার সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দিয়ে কি যেন আঁতিপাতি করে খুঁজছে। সে জিজ্ঞেস করলঃ

—কোথায় থাক?

না, না, কুকুর নয়। এ আর কারো স্বর। হাঁ, আরো কে দাঁড়িয়ে আছে। উঁচু বুট দেখতে পাচ্ছি, আর এক জোড়া, আর এক জোড়া। আর সামরিক পোশাক। আর বেশি উঁচুতে চোখ যাচ্ছে না, মাথা তুলতে গেলে ঝিমঝিম করছে। কে কেয়ার করে, আমাকে ঘুমোতে দাও এবার।

বুধবার।

যারা গান গাইছিল তারা এবার টেবিলে বসে একটা মাটির পাত্রে কি খাচ্ছে। এখন দুজনকে পৃথকভাবে চিনতে পারছি। একজন বেশ অল্প-বয়েসী, আর তারা সন্ন্যাসীও নয়। এটা মঠের কুঠরি নয়, জেলের। মেঝের তক্তা যেন চোখের সুমুখে দৌড়ে যাচ্ছে, তারই এক প্রান্তে একটা মজবুত দরজা, কেমন অশুভ ইঙ্গিতময়।...

চাবি ঘুরছে তালায়। লোক দুজন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। একেবারে তৈরী। এস্-এস্ উর্দিপরা আর দুজন লোক ঘরে ঢুকে আমাকে পোশাক পরিয়ে দিতে ওদের হুকুম দিল। ভাবতেও পারিনি, প্রতি মোজায় আর আস্তিনে এত ব্যথা লুকিয়ে আছে। আমাকে একটা স্ট্রেচারের উপর শুইয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নিয়ে চলল; লম্বা বারান্দায় ওদের ভারি বুটের শব্দ বাজছে...এই তাহলে সেই পথ যে-পথে ওরা চেতনা হারাবার পর আমাকে নিয়ে গিয়েছিল? কিন্তু কোথায় পোঁছবে এপথ? কোন নরকে গিয়ে শেষ হবে?

প্যানক্রাটস্ জেলখানার অভ্যর্থনা ঘর। সহানুভূতিহীন বিষণ্ণ ছায়াঘন পরিবেশ। ওরা আমাকে মেঝেয় নামিয়ে রাখল। কে যেন চেক ভাষায় অনুবাদ করে শোনাচ্ছে—এক ক্রুদ্ধ জার্মান কণ্ঠস্বর। দোভাষীর স্বরে বন্ধুত্বের ছলনা।

—ওকে তুমি চেন?

আমি নিজের চিবুক হাত দিয়ে তুলে ধরলাম। স্ট্রেচারের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণী। লম্বাটে তার মুখ। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গর্বভরে, চোখদুটো শুধু নিচু দিকে নামানো—আমাকে দেখা আর দৃষ্টি দিয়ে সম্ভাষণ জানাবার জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু।

ওকে আমি চিনি না।

মনে হচ্ছে, একবার ওকে দেখেছিলাম, সেও এক মুহূর্তের জন্য। পেটচেক বিল্ডিং-এ, সেই রাত্রে!—আজ দ্বিতীয়বার আবার দেখা হোল। কিন্তু হায়, তৃতীয়বার তো আর দেখা হবে না। গর্বভরে সে যে এখন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, এর জন্য তো ওর হাতে হাত দিয়ে একটু চাপ দেওয়াও চলবে না। সে আর্নস্ট লোরেঞ্জের স্ত্রী। ১৯৪২ সালে যখন সামরিক আইন জারি হয়, তখন ওরা ওকে হত্যা করে।

—কিন্তু একে তুমি নিশ্চয়ই চেনো।

আনিচ্‌কা জিরাস্কোভা! দোহাই তোমার, তুমি কি করে এখানে এলে আনিচকা? আমি তো তোমার নাম বলিনি, আমার সঙ্গে তো তোমার কোনো সম্বন্ধ ছিল না। তোমাকে আমি চিনি না, জানি না, বুঝেছ, তোমাকে আমি সত্যিই চিনি না।

—না, ওকে চিনি না।

অবুঝ হোয়ো না!

—না, ওকে আমি চিনি না।

—জুলো, এখন আর ওতে কিছু যায় আসে না। আনিচ্‌কা বলল। আঙুল দিয়ে একখানা রুমাল তালগোল পাকাচ্ছে—ওর উত্তেজনা ধরা পড়ছে। এখন আর ওতে কিছু যায় আসে না। আমাকে আর একজন সনাক্ত করেছে।

—কে?

—চুপ! ওরা ওকে বলতে দিল না। আমার দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে দিল, ওরা জোরে ধাক্কা মেরে ওকে একপাশে সরিয়ে দিল।

আনিচ্‌কা!

আর ওদের প্রশ্ন শুনতে পাচ্ছি না। ব্যথা নেই, আমি বেশ দূরে দাঁড়িয়ে আছি এমনি দর্শক। মনে হচ্ছে, দুজন এস্‌-এস্‌ সেজন্য আমাকে আবার সেলে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে। ওঃ কি নিষ্ঠুরভাবে ঝাঁকুনি দিচ্ছে স্ট্রেচারে! হাসতে হাসতে ওরা জিজ্ঞেস করছে, আমি গলায় ফাঁস দিয়ে মরতে রাজি কিনা।

বৃহস্পতিবার।

আবার যেন সব দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি। আমার কয়েদী সঙ্গীদের যেটির কম বয়েস তার নাম কারেক। সে বয়স্ক লোকটিকে 'বাবা' বলে ডাকে। ওরা আমাকে ওদের নিজেদের সম্বন্ধে বলেছে, কিন্তু আমার কিছু মনে নেই, সব যেন ঘুলিয়ে গেছে। ওরা খনির কথাও যেন বলছিল। বেঞ্চে কটি ছোটছোট ছেলে মেয়ে বসে ছিল—সে কথাও। ঘণ্টা বাজছে, কোথাও আগুন লেগেছে বোধ হয়। ওরা বলে রোজই এক ডাক্তার আমাকে দেখতে আসেন আর আসে এক এস্‌-এস্‌ আর্দালী। আমার অবস্থাটা নাকি খুব সঙ্গীন নয়, ওরা তো বলে শিগ্‌গীরই পুরোপুরি সেরে উঠব। হাঁ, 'বাবা'তো একথা জোর দিয়েই বলে, কারেকও ব্যগ্রভাবে সায় দেয়। আমার এত দুঃখের মধ্যেও বুঝতে পারি, ওরা মিথ্যে কথা বলছে। চমৎকার লোক! ওদের বিশ্বাস করতে পারছি না বলে আমি সত্যিই দুঃখিত।

বিকেল।

সেলের দরজা খুলে গেছে। পা টিপে টিপে ধীরে ধীরে ঢুকছে কুকুরটা। আমার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, আমাকে দেখছে। তন্ন তন্ন করে কি যেন খুঁজছে। আবার দু-জোড়া ভারি বুট। এখন জানতে পেরেছি, একজোড়া কুকুরের মালিকের। সে প্যানক্রাটস জেলখানার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। আর এক জোড়ার মালিক গেস্টাপোর কমিউনিস্ট-বিরোধী বিভাগের কর্তার। আমার প্রথম রাতের জেরার ভার ছিল তারই ওপর। তাছাড়া বে-সামরিক কয়েকটা পাজামা। আমার নজর উপর দিকে চলে এল—হাঁ, চিনতে পারছি, এই সেই ঢেঙা কমিসারটি, হানাদার বাহিনীর নেতৃত্ব করছিল সেদিন। সে চেয়ারে বসে প্রশ্ন শুরু করলে।

—তোমার লীলাখেলা তো সাঙ্গ! এবার অন্তত নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা কর। বল, কথা বল!

সে আমাকে একটা সিগারেট দিল। না, সিগারেট চাই না। সহ্য হচ্ছে না!

—বাকসাসদের সঙ্গে কতদিন ছিলে?

বাকসাসদের সঙ্গে । রীতিমতো অসহ্য। কে ওদের বলল?

—দেখছ তো, আমরা সবই জানি। এবার বলে ফেল!

যদি জানই, আমাকে আর বলতে হবে কেন? আমার জীবন বৃথা নষ্ট করিনি, শেষদিন কটাও ব্যর্থ করে দিতে রাজি নই।

একঘণ্টা ধরে চলেছে জেরা আর তদন্ত। সে চিৎকার করে কথা বলে না; ধৈর্য সহকারে সে বার বার একই প্রশ্ন করে এবং যখন উত্তর আসে না, সে আর একটা প্রশ্ন করে, তারপর আর একটা। যেন শেষ নেই।

—এখনও বুঝতে পারছ না? এই তোমাদের শেষ। তোমরা হেরে গেছ।

—না, শুধু আমি হেরে গেছি।

—কমিউনিজমের জয়ে এখনও তোমার বিশ্বাস?

—তা তো স্বাভাবিক।

—ও এখনও বিশ্বাস করে? কর্তা জার্মান ভাষায় বললেন, ঢেঙা কমিসার অনুবাদ করে শোনাল—হাঁ, এখনও রুশিয়ার জয়লাভে সে বিশ্বাসী।

—হাঁ, তাই তো স্বাভাবিক। অন্যথা তো হবে না।

আমি ক্লান্ত। দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে সতর্কতা বজায় রেখে ছিলাম, এখন চেতনা দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে, যেমন করে গভীর ক্ষত থেকে ঝরে পড়ে রক্তধারা। ওরা যেন হাত বাড়িয়ে দিয়েছে—আমার কপালে বুঝি দেখেছে

মৃত্যুর ছাপ। কোন কোন দেশে নিয়ম আছে জল্লাদ হুকুম তামিল করবার আগে দণ্ডিতকে চুমু খায়।

সন্ধ্যা।

দুজন লোক করজোড়ে বৃত্তাকারে ঘুরছে, একজনের পিছনে আর একজন, গাইছে শোকগাথা, কর্কশ কান্নার স্বরেঃ

সূর্যের তাপ আর তারার আলো
চিরতরে যবে যায় গো মিলিয়ে যায়।...

ওগো ভাল মানুষেরা, চুপ কর! হয় তো গানটা ভালোই, কিন্তু আজ, আজ তো পয়লা মের আগের দিন—সব চাইতে সুন্দর আর আনন্দের দিন। ছুটির দিন। একটা আনন্দের সুর ভাঁজতে চেষ্টা করছি, কিন্তু হয় তো আরও বিষণ্ণতাই ফুটে উঠল, ছোকরা কারেক মুখ ফিরিয়ে নিল, 'বাবা' তো চোখই মুছছে। কিন্তু কে শোনে, গেয়ে চলেছি, ওরাও যোগ দিল। আস্তে আস্তে গাইছে। বেশ খুশি মনে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পয়লা মে-র ভোর।

জেলখানার গম্বুজের ঘড়িতে বাজলো তিনটে। এই প্রথম আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। এখন আমি পূর্ণ সচেতন। খোলা জানলা দিয়ে বিশুদ্ধ হাওয়া আসছে, মেঝেয় পাতা গদির চার দিকে খেলে বেড়াচ্ছে, হাঁ, অনুভব করতে পারছি খড়গুলো লাগছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, আমার দেহের প্রতি জায়গায় যেন হাজার বেদনা জড়িয়ে আছে। হঠাৎ জানালা খুলে দিলে যেমন সব স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনি বুঝলাম আমার অন্তিমকাল এসেছে। আমি মরছি।

অনেক দেরি করে এলে মরণ। এক সময়ে আশা ছিল, বহু বহুদিন পরে তোমার সঙ্গে হবে আমার পরিচয়। স্বাধীন মানুষ হয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম। কত কাজ করতেও তো চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম ভালবাসতে। ভেবেছিলাম ঘুরে বেড়াব পৃথিবীতে, আনন্দে গান গাইব। তখন আমি পূর্ণ বয়স্ক, দেহে ছিল অমিত শক্তি। আর তো শক্তি নেই। উবে যাচ্ছে।

জীবনকে আমি ভালোবেসে ছিলাম, তারই সৌন্দর্যের সন্ধানে আমি নেমেছিলাম সংগ্রামে। তোমাদের ভালোবেসেছি, হে জনগণ। যখন তোমরা ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছ, খুশি হয়েছি। যখন আমাকে ভুল বুঝেছ দুঃখও পেয়েছি। যদি কারও ক্ষতি করে থাকি, ক্ষমা কোরো। কাউকে

যদি আনন্দ দিয়ে থাকি, ভুলে যেও। আমার নামের সঙ্গে যেন বিষণ্ণতা না জড়িয়ে থাকে। তোমাদের কাছে এই আমার শেষ অনুরোধ। বাবা, মা, বোন, আমার গাস্তা আর কমরেডরা—যাদের আমি ভালোবাসি তাদের কাছে আমার এই অনুরোধ। যদি মনে কর, চোখের জল বিষাদের ম্লান ধূলো ধুয়ে দিতে পারবে, তবে ক্ষণেকের জন্য কেঁদো, কিন্তু দুঃখ কোরো না। আমি আনন্দের জন্যই বেঁচেছিলাম; আজ আনন্দের জন্য, মানুষের সুখের জন্য মরছি। আমার কবরের উপর আজ বিষাদের দূতকে ডেকে আনলে তো অবিচারই হবে।

পয়লা মে! এমনি ভোররাত্রে আমরা শহরতলীতে জেগে উঠে তৈরী হতাম। এই মুহূর্তে মস্কোর পথে পথে প্রথম দলটি প্যারেডের জন্য তাদের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে লাখো লাখো মানুষ আজাদীর জন্য লড়ছে শেষ লড়াই, হাজার হাজার প্রাণ দিচ্ছে সংঘর্ষে। তাদের একজন হতে পারায় সুখ আছে, হাঁ শেষ লড়াইয়ের একজন সৈনিক।

কিন্তু মরণে তো আনন্দ নেই। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ছাড়তে পারছি না নিশ্বাস। গলায় ঘড়ঘড় শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আমার আশেপাশের কয়েদীদের হয়তো জাগিয়ে দেব। একটু জল খেলে বোধ হয় আরাম পাব...কিন্তু পাত্রে তো জল নেই। আমার থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে কুঠরির ঠিক কোণে শৌচের জল রাখবার পাত্র, ওতে প্রচুর জল আছে। সে জল গড়িয়ে খাবার মতো শক্তি হবে কি?

বুকে ভর করে, আস্তে আস্তে চলেছি—যেন কাউকে না জাগানোর ভিতরেই রয়েছে মৃত্যুর সমস্ত মহিমা। শেষে পোঁছলাম এসে। লোভীর মতো শৌচের জল পান করছি।

কতক্ষণ লাগল জানি না, বুকে ভর দিয়ে ফিরে যেতেই বা কত দেরী হোল তাও জানি না। আবার চেতনা লোপ পাচ্ছে। কব্জি চেপে ধরে নাড়ি খুঁজছি, কিন্তু পাচ্ছি না। প্রাণ যেন গলায় এসে ঠেকেছে, লাফাচ্ছে; আবার নিস্তেজ হয়ে পড়ল। আমিও পড়লাম অবশ হয়ে, কতক্ষণ পড়ে রইলাম কে জানে। হঠাৎ শুনতে পেলাম কারেকের স্বর।

—বাবা, বাবা, শুনছ? বেচারী মারা যাচ্ছে।

ভোরে ডাক্তার এল।

কিন্তু এসব শুনেছি অনেক পরে।

সে এসে পরীক্ষা করে মাথা নাড়ল। তারপর হাসপাতালে ফিরে গিয়ে মৃত্যুর রিপোর্ট ছিঁড়ে ফেলল। কাল সন্ধ্যায় আমার নামে এই রিপোর্ট সে লিখেছিল। তারপর অভিজ্ঞের মতো নিশ্চিত হয়ে সে বললঃ

—ওর ঘোড়ার মতোই তাকদ।

তিন

দ্বশো সাতষট্টি নং সেল

জানালা থেকে দরজা, আবার দরজা থেকে জানালা। সাত পা এগ্বনো আর পেছ্বনো।

হাঁ, জানি বইকি।

কতবার এই ব্যবধানটুকু পার হয়েছি, পায়চারী করেছি প্যানক্রাটস-এর এই সেলের পাইন তক্তার মেঝেয়—কতবার! আমাদের নগরবাসীদের ধ্বংসাত্মক নীতি চেক জাতির কি ক্ষতি করবে স্পষ্ট ব্ঝতে পেরেছিলাম বলেই ব্ঝি এখানে বসে আছি। আমার জাতি এখন ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে; আমার সেলের সম্মুখে পায়চারি করছে জার্মান রক্ষীদল। বাইরে কোথায় যেন রাজনৈতিক নিয়তি বিশ্বাসঘাতকতার স্বতো কাটছে। চোখ মেলে তাকাতে মান্বষের ক'শতাব্দী লাগে? আগামীর পথে এগ্বতে ক'হাজার জেলের সেল মান্বষকে পেরোতে হয়েছে? আরও কত পেরোতে হবে? হে নের্বদার খৃষ্ট-শিশ্বর দল, মান্বষের ম্বক্তির পথের ব্ঝি শেষ নেই। কিন্তু মান্বষ তো জেগেছে, অবশেষে জেগেছে।

সাতপা এগ্বনো, আর সাতপা পেছ্বনো। দেয়ালের পাশে ভাঁজকরা খাটিয়াটা, আর একধারে একটা বিশ্রী তাক। তার উপর মাটির একটা ভাঁড়। হাঁ, সবইতো জানি। জেলখানাগ্বলোয় এখন যন্ত্রয্বগের ছোঁয়া লেগেছে। তাপের ব্যবস্থা আছে, প্বরনো দিনের বালতির বদলে চেন টানা পায়খানা—লোকগ্বলোও কেমন যন্ত্রের মতো যেন। হাঁ, ওরা যন্ত্রের মতোই। একটা বোতাম টেপ, দরজার তালায় তখনই চাবি ঘোরানোর শব্দ উঠবে, বা উঁকি মারবার ফোকর খ্বলে যাবে—আর কয়েদীরা উঠবে লাফিয়ে—তা তখন যা-ই কর্বক না কেন। দরজা খ্বলে যেতেই সেলের কয়েদীদের মধ্যে সব চাইতে যে বড় তাকে চেঁচিয়ে উঠতে হবে এক নিঃশ্বাসেঃ

—তৈয়ার! দ্বশো সাতষট্টি নম্বর সেলে তিনজন লোক—সব ঠিক আছে।

দ্বশো সাতষট্টি নম্বর আমাদের সেল। কিন্তু যন্ত্রগ্বলো আজ ঠিক ঠিক চলল না। দ্বজন শ্বধ্ব লাফিয়ে উঠল। জানালার নিচে আমি খড়ের গদিতে চুপ করে শ্বয়ে আছি—একহপ্তা এমনি পড়ে আছি—ব্ঝিবা দ্ব-হপ্তা

একমাস বা ছ-হপ্তাই হবে। আবার যেন নতুন করে জন্ম নিয়েছি। এখন মাথা ফেরাতে পারি, হাতও তুলতে পারি। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠতে পারি, উঁচু হতেও কষ্ট হয় না। তাড়াতাড়ি লিখতেও পারছি, তখন তো তা সম্ভব হোত না।

সেলে পরিবর্তন ঘটেছে। দরজায় তিনজনের বদলে দুজনের নাম। কারেক অদৃশ্য, সেই যে অল্প বয়েসী ছেলেটি। ওরাই আমার অন্ত্যেষ্টির শোকগাথা গাইছিল। শুধু সে সহৃদয়তার স্মৃতি রেখে গেছে। ওকে আধো স্বপ্নে দেখতে পাই। শেষ দু-দিনের স্মৃতি মনে আছে। সে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বারবার বলছিল, আর আমি প্রতিবারই ওর কাহিনীর মাঝখানেই ঘুমিয়ে পড়ছিলাম।

ওর নাম কারেক মালেৎস্। মিস্ত্রী। আগে হুর্ডলিৎস-এর কাছে কোনো লোহার খনিতে কাজ করত। সে কিছু বিস্ফোরক পদার্থ সরিয়েছিল। গোপন যুদ্ধে সেগুলো দরকার। দু-বছর আগে গ্রেফতার হয়, এবার চলেছে বার্লিনে। সেখানে বিচার হবে। একটা গোটা দলই যাচ্ছে, কে জানে কি শাস্তি হবে? তার বৌ আর ছেলেমেয়ে আছে, তাদের সে খুবই ভালবাসে—তবু...এ আমার কর্তব্য, এ ছাড়া তো অন্য উপায় ছিল না।

আমার খাটিয়ায় এসে বসে সে আমাকে খাওয়াতে চেষ্টা করত, আমি খেতে পারতাম না। শনিবার—সেদিন আমার এখানে আসার আটদিনই বুঝি হবে?—সে এক শেষ চাল চাললো, সে পুলিস মাস্টারকে খবর দিল, আমি এসে পর্যন্ত কিছু খাই নি। এস্ এস্-এর উর্দিপরা প্যানক্রাটস্ জেলখানার এই হুকুমবরদারটি সব সময়েই উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। তার হুকুম না পেলে চেক ডাক্তারের একটা অ্যাসপিরিনের ব্যবস্থা দেওয়ারও ক্ষমতা নেই। সে এক মগ ভরতি হাসপাতালের সুপ নিয়ে এসে যতক্ষণ না আমি গিলে ফেলি, ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। কারেক খুশি। জোর করে খাওয়াবার আরজি পেশ করে সে সফল হয়েছে। সে নিজেই পরদিন আমাকে এক মগ সুপ খাওয়াল।

কিন্তু বেশী খেতে পারি না। আমার ক্ষতবিক্ষত মাড়ি দিয়ে আমাদের রোববারের গুলাসের (মাংসের ঝোল) সিদ্ধ আলুও চিবোতে পারছি না, গাল ফুলে গেছে, ছোট্ট গ্রাসও গলা দিয়ে নামতে চায় না।

—ও গুলাসও খেতে চায় না। কারেক নালিশ করে আর বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে।

তারপর সে নিজেই 'বাবার' সঙ্গে ভাগ বাঁটোয়ারা করে খেয়ে ফেলে আমার খাবার।

যারা ১৯৪২ সালের প্যানক্রাটস্-এর অতিথি হওনি, তারা গুলাসের স্বাদ তো বুঝবে না। সেই দুর্দিনে যখন আমাদের পাকস্থলী ক্ষিদের জ্বালায় ককিয়ে উঠতো, যখন হপ্তার ধারাস্নানের সময় দেখা যেত মানুষের চামড়া মোড়া কঙ্কালদের, এমন কি ঘনিষ্ঠতম বন্ধুও তখন তোমার খাবার চুরি করতে দ্বিধা করত না, অন্তত চোখের দৃষ্টি দিয়েও তো করত। আমাদের কাছে তখন শুটকি শাকসব্জির ঘণ্ট আর জল দিয়ে গোলা টোমাটো সস্‌ও উপাদেয় খাদ্য। তখন হপ্তায় আমাদের খাবার ভাঁড়ে আলু দেখতে পেতাম বৃহস্পতি আর রোববার, আলুর উপরে এক চামচে গুলাসের ঝোল আর মাংসের পাতলা টুকরো। চমৎকার লাগত খেতে—স্বাদের চেয়েও এরই মধ্যে পেতাম মানুষের জীবনের বাস্তব স্পর্শ। গেস্টাপো কয়েদখানার অস্বাভাবিকতার মধ্যে এইটিই যেন খানিকটা সভ্যতার ছোঁয়া, স্বাভাবিক জীবনের দান। কি আনন্দেই না গুলাস নিয়ে কথা বলতাম! এক চামচে মাংসের ঝোল মুমূর্ষুর দৈনন্দিন ভীতির সঙ্গে মিশে যে কত মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে তা কে বুঝবে!

দু-মাস যেতেই বুঝলাম্ আমি গুলাস খেতে অস্বীকার করায় কারেক কেন ভয় পেয়েছিল। আমি গুলাস খেতে চাই না, এই তো আমার আসন্ন মৃত্যুর সব চাইতে স্পষ্ট প্রমাণ।

পরের রাতেই ওরা কারেককে দুটোর সময় এসে জাগালো। পাঁচ মিনিটের ভিতরেই তৈরী হয়ে রওনা হতে হবে। যেন সে এক মুহূর্তের জন্য যাচ্ছে। এতো জীবনের শেষ যাত্রা নয়। আর এক কয়েদখানায়, বন্দীশিবিরে কি ফাঁসীকাঠে—কে জানে কোথায় যাচ্ছে? সে আমার খাটিয়ার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। একটু দেরিই করছে। আমার মাথাটা জড়িয়ে ধরল দু-হাত দিয়ে, চুমু খাচ্ছে। এবার শোনা গেল উর্দিপরা রক্ষীর বর্বর চিৎকার বারান্দায়। তারা চেঁচিয়ে বলছে, প্যানক্রাটস্-এর জেলখানায় উচ্ছ্বাসের স্থান নেই। কারা দরজার বাইরে ছুটে গেল। আবার তালা বন্ধ। এখন সেলে আমরা দু-জন।

আবার কি দেখা হবে? এবার কার পালা? দু-জনের কে আগে যাবে? কোথায়? ওর জন্য কে আসবে? এস্-এস্ উর্দিপরা রক্ষী—না মৃত্যু? মৃত্যুর তো কোনও উর্দি নেই?

জেলখানার এই প্রথম বিদায়ের পর যে ভাবনা জুড়ে বসেছিল মনে তারই প্রতিধ্বনির অনুসরণে লিখছি। তারপর এক বছর কেটে গেছে। বন্ধুর বিদায় বেলায় যে ভাবনা এসেছিল, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বার বার। কখনও বা ব্যথা বেশী হয়েই দেখা দিয়েছে, কখনও বা কম ব্যথা পেয়েছি। আমাদের সেলের দুটো নাম তিনে দাঁড়াল একবার, আবার দুই-এ ফিরে এল—

আবার তিন, দুই, তিন, দুই—নতুন কয়েদীদের এমনি আসা যাওয়া চলছেই। দু-জন শুধু দুশো সাতষট্টি নম্বর সেলের চিরস্থায়ী আর বিশ্বস্ত বাসিন্দেঃ

হাঁ, আমি আর 'বাবা'।

'বাবা' ষাট বছর বয়সের শিক্ষক। নাম জোসেফ পেসেক। যে সব শিক্ষক গ্রেফ্‌তার হয়েছিল তাদের মধ্যে সব চাইতে প্রবীণ। আমার আসার আগে তার প'চাশী দিনের মেয়াদ হয়ে গেছে। সে জার্মান রাইখের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর চেক স্কুলগুলো কেমন উন্নত হবে তারই এক খসড়া তৈরী করছিল।

'বাবা' লোকটি...

সব কথা কি লেখা যায়? এক বছর এক সেলে দু-জন লোকের জীবনের বর্ণনা তো এক বিরাট ব্যাপার। এরই মধ্যে বাবার নামের কোটেশন মার্কা মিলিয়ে গেছে। বিভিন্ন বয়সের দু-জন বন্দী সত্যই এখন পিতা আর পুত্র। এরই মধ্যে পরস্পরের ভাবভঙ্গী, প্রিয় শব্দ, এমন কি স্বরও দু-জনে গ্রহণ করেছি। আজ তুমি বলতে পারবে না, সেলের কোন জিনিসটা তার, কোনটা আমার, আমি কি নিয়ে এসেছিলাম, সে-ই বা কি এনেছে।

রাতের পর রাত সে আমার পাশে জেগেছে, সে'ক দেবার ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে আসন্ন মৃত্যুকে দিয়েছে তাড়িয়ে। সে আমার পু'জ পরিষ্কার করেছে ক্ষত থেকে; কখনও এমন ভাব দেখায়নি যে, পু'জের দুর্গন্ধে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। অথচ গন্ধ তো খাটিয়ার চারদিকে লেগেই আছে। আমার সার্ট ধুয়ে রিপু করে দিয়েছে। যখন আর সেলাই চলেনি, নিজেরই একটা পরিয়ে দিয়েছে আমাকে। জেলখানার উঠোনে আর আধঘণ্টা শরীর চর্চার ফাঁকে একদিন নিজের জীবন বিপন্ন করে সে নিয়ে এল একটা ছোট্ট ডেইজি ফুল আর এক গোছা ঘাস। শুনানীর জন্য ওরা যখন আমাকে নিয়ে যেত ওর চোখ আমাকে অনুসরণ করত। ফিরে এলে আমার নতুন ক্ষতস্থানে নেকড়ার পট্টি বে'ধে দিত। আমাকে রাতে নিয়ে গেলে, যতক্ষণ আমাকে না ফিরিয়ে দিয়ে যেত ততক্ষণ সে থাকত জেগে। আমাকে এনে শুইয়ে দিত খাটিয়ায়, কম্বল টেনে দিত গায়ে।

এমনি করেই আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠল প্রথম রাতের ধোলাইয়ের পর। তারপরে আমি যখন উঠতে পারতাম, পিতৃঋণ শোধ করতে চেষ্টা করতাম; তখনও সে সম্পর্ক নষ্ট হয়নি।

একবারে বসে তো সব কিছু লেখা যায় না। দুশো সাতষট্টি নম্বর সেলের সে বছরের জীবনে সমৃদ্ধি ছিল বই কি, শ্রীও ছিল। 'বাবা' তার নিজের খেয়াল খুশিতে কাটাল একবছর। কিন্তু কাহিনী তো এখনও হয়নি—আশার ঝংকার তাইতো শুনতে পাচ্ছি।

দুশো সাতষট্টি নং সেলের সমৃদ্ধ জীবন কাটতে লাগল। মাঝে মাঝে দরজা খুলে যেত, প্রহরে প্রহরে চলত পর্যবেক্ষণ। কমিউনিস্ট পাপীদের পর্যবেক্ষণের জন্য এই ছিল হুকুম, বোধ হয় স্বাভাবিক কৌতুহল থেকেই তা হোত। মরবে না এমনি লোক এখানে বহু মরেছে, কিন্তু এমন খুব কমই হয়েছে যে, যার মরবার আশা সবাই করছে সেই আছে বেঁচে। অন্য ওয়ার্ড থেকে রক্ষীরা এসে কতদিন জোরে কথা বলেছে আমার সম্বন্ধে, কম্বল তুলে নিঃশব্দে দেখেছে, কেউ বা বিশেষজ্ঞের মতোই ক্ষতস্থানগুলো পরীক্ষা করেছে, তারপর স্বভাব অনুযায়ী কেউ বা করেছে ঠাট্টা, কারও বা স্বরে দেখা দিয়েছে মিতালির একটু আমেজ। তাদের একজনকে আমরা স্মার্টি বলে ডাকি। আর সবার চাইতে, সেই ঘন ঘন আসে, প্রাণখোলা হাসি হেসে বলে, 'লাল শয়তানের' কিছু চাই নাকি? না ধন্যবাদ, কিছুই চাই না। ক'দিন পরেই স্মার্টি আবিষ্কার করল লাল শয়তানের কিছু চাই—হাঁ, দাড়ি কামানো চাই বই কি। তাই সে নাপিত ডেকে নিয়ে এল।

আমাদের সেলের বাইরের প্রথম কয়েদী, যার সঙ্গে পরিচয় হোল—সে এই নাপিতটি। কমরেড বচেক। কিন্তু স্মার্টির সদিচ্ছা প্রণোদিত দয়া নিষ্ঠুরতা হয়েই দেখা দিল। 'বাবা' আমার মাথা টিপে ধরল, এদিকে বচেক খাটিয়ার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে দাড়ি কামাতে লাগল তার ভোঁতা ক্ষুরে। হাত তার কাঁপছে, চোখ জলে ভরে গেছে, কেননা, তার বিশ্বাস সে একটা লাসের দাড়ি কামাচ্ছে। আমি তাকে অভয় দিলাম।

—ভয় পেও না! যখন পেটচেক বিল্ডিং-এর ধোলাই খেয়ে বেঁচে ফিরেছি তোমার কামানোও সইতে পারব।

কিন্তু দুজনেই দুর্বল, তাই থেমে একটু জিরিয়ে নিতে হোল।

দুদিন পরে আরও দুজন কয়েদীর সঙ্গে পরিচয়। পেটচেক বিল্ডিং-এর কমিসার ভদ্রলোকেরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। রোজ তারা আমার জন্য লোক পাঠাচ্ছেন আর পুলিস-মাস্টার একটুকরো কাগজে লিখে পাঠাচ্ছেঃ চালান দেবার অনুপযুক্ত। তাই এবার যাই হোক না কেন, তারা পাঠাতে বললেন। উর্দিপরা দুজন কয়েদী এসে দাঁড়াল স্ট্রেচার নিয়ে আমাদের সেলের সামনে। 'বাবা' একটা পোশাক কোন রকমে গায়ে পরিয়ে দিল। এবার ওরা আমাকে শুইয়ে দিল স্ট্রেচারের উপর। তারপর বয়ে নিয়ে চলল। তাদের একজন কমরেড স্কোরেপা, ও সবার জন্য সারাদিন উদ্বিগ্ন থাকে বলে তাকে 'বাবা' বলা হয়। আর দ্বিতীয়,—সে আমার উপর ঝুঁকে আছে। সিঁড়ি দিয়ে নামাচ্ছে স্ট্রেচার, ঝাঁকুনি লাগছে। সে বলছে, শক্ত করে আঁকড়ে থাক।

তারপর ফিসফিসিয়ে আবার : শক্ত করে আঁকড়ে থাক—হাঁ, দুই ভাবেই কথাটা বলছি।

এবার আর অভ্যর্থনা ঘরে থামিনি। ওরা আমাকে নিয়ে এসেছে এক হল ঘরে। লোক ভর্তি। আজ বৃহস্পতিবার। আত্মীয়রা কয়েদীদের জন্য ধোয়া কাপড় জামা নিয়ে এসেছে, এই ক'দিনের পরা পোশাক নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের এই নিরানন্দ মিছিলের দিকে ওরা সহানুভূতির দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে। আমি এসব পছন্দ করি না। মাথায় হাত তুললাম, মুঠোকরা হাত। ওরা হয়তো সেলাম বলে মনে করবে, নয়তো এক তুচ্ছ ভঙ্গী। কিন্তু আর শক্তি নেই, না, একটা কথা বলারও শক্তি নেই।

জেলের উঠোনে ওরা স্ট্রেচারখানা একটা ট্রাকে তুললো। দুজন এস্-এস্-এর লোক বসেছে চালকের পাশে, দুজন দাঁড়িয়েছে আমার শিয়রে। তাদের হাত কোমরবন্ধের রিভলভারের খাপে। এমনি করেই আমরা চললাম। রাস্তা খারাপ, একটা গর্ত থেকে আর একটা গর্তে লাফিয়ে চলেছে চাকা। একশো গজ যেতে না যেতেই আমি চেতনা হারালাম। প্রাহার রাস্তা দিয়ে এ এক কৌতুক যাত্রা বটে—একটা পাঁচটন ট্রাক, তিরিশজন কয়েদী ধরে—কিন্তু গ্যাসোলিন আছে একটনের মতো। দুজন এস্-এস্ সামনে, দুজন পিছনে, তাদের রিভলভার আর শকুনীর মতো তীক্ষ্ণ চোখ পাহারা দিচ্ছে এক মৃতদেহকে। সর্বদা ভয়, পাছে বুঝি সে তাদের হাত থেকে পালিয়ে যায়।

আমি হতচেতন বলে শুনানি হল না, ওরা আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেল প্যানক্রাটস-এ। পরদিন আবার একই প্রহসনের পুনরাবৃত্তি। এবার পেট-চেক বিল্ডিং-এ পৌঁছনো পর্যন্ত চেতনা ছিল। শুনানি বেশিক্ষণ হোল না। কমিসার ফ্রিডরিখ আমার দেহ একটু অসাবধান ভাবেই স্পর্শ করেছিলেন, তাই ওরা আমাকে অচেতনই ফিরিয়ে নিয়ে এল।

তারপর ক'দিন কাটল, তখন বেঁচে আছি কিনা সে সন্দেহ ছিল না। ব্যথা—জীবনের যমজ বোন ব্যথা—সে-ই সর্বদাই আমাকে রূঢ়ভাবে স্মরণ করিয়ে দিল সে-কথা। সমস্ত প্যানক্রাটস জানলো আমি এখনও বেঁচে আছি, তারা জানালো অভিনন্দন। পুরু দেয়াল ভেদ করে সাংকেতিক টোকার শব্দ ভেসে এল। রক্ষীরা যখন খাবার নিয়ে এল, তাদের চোখে পড়লাম সে ভাষা।

শুধু আমার স্ত্রীই আমার কোনও খবর পেল না। সে তখন আমারই নিচের তলায় কয়েক নম্বর দূরে এক সেলে একা বন্দী। আশা আর আশঙ্কার ভিতরে দিন কাটাচ্ছে। একদিন পাশের সেলের একটি স্ত্রীলোকের কাছ থেকে শরীর-চর্চা করবার সময় খবর পেল, আমি মরে গেছি। পয়লা বারের

অত্যাচার সইতে পারিনি। এমনি আঘাত পেয়ে, আমার স্ত্রী উঠানে ঘুরে বেড়ালো যেন স্বপ্নের ঘোরে, নারী-রক্ষী তাকে সারের ভিতরে ঠেলে দিলে বার বার, ঘুষি পড়ল তার মুখে, কিন্তু সে টের পেল না। সেদিন তার দুটি আয়ত চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল কোন দৃশ্য? সারাদিন সেলের দেয়ালের দিকে চেয়ে কি সে ভাবছিল? এতই দুর্বল, কাঁদতেও পারেনি? পরদিন আর এক গুজব শুনলো, আমাকে ওরা পিটিয়ে মারেনি, যন্ত্রণা এড়াবার জন্য সেলের ভিতরে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছি।

সে যখন এমনি ধরনের কথা শুনত, আমি তখন বিশ্রী খাটিয়ায় শুয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে প্রতি সন্ধ্যায় আমার গাস্তিনার প্রিয় গান গাইতাম। কেন, কেন সে শুনতে পেত না? আমিতো আমার সবখানি দরদ দিয়েই গাইতাম?

আজ সে কিন্তু জানে, শুনতে পায় সেই গান—সেদিনকার থেকে বহু দূরে, তবু সে শুনতে পায়। দুশো সাতষট্টি নম্বর সেলে গান হয়, এ সম্বন্ধে রক্ষীরাও ওয়াকিবহাল। এখন আর দরজায় ঘা মেরে তারা চুপ করতে বলে না।

হাঁ দুশো সাতষট্টি নম্বর সেলে গান গায়। জীবনভোর গান গেয়েছি, আজ শেষ প্রান্তে এসে থামবার তো কারণ দেখছি না। এখনই তো আমি বেশি করে বাঁচছি। আর বাবা পেসেকের কথা? ও এক অস্বাভাবিক চরিত্র, গান গাইতে কি ভালোই না বাসে! গলা ভালো নয়, সুর জ্ঞান নেই—নেই স্মৃতি, কিন্তু তবু গান ভালবাসে।

সে ভালোবাসা সুন্দর। তাতে বিশ্বস্ত অনুরাগ আছে। গান এত ভালোবাসে বলেই ও যখন এক সুর থেকে আর এক সুরে চলে যায়, আমি তো টের পাই না। কান যখন একটা সুরের জন্য তৈরী ও-তখন হয় তো আর একটা সুর জোর করে গেয়ে যায়। যখনই মেজাজ ভালো থাকে আমরা গান গাই। কখনও বা মন কামনায় ভারাক্রান্ত হলেও গান ঝরে পড়ে। কোনও সাথী হয়তো বিদায় নিচ্ছে, আর দেখা হবে না—তখন গাই গান। পূর্ব সীমান্ত থেকে ভালো খবর এলেও চলে গান। আনন্দের জন্য, সান্ত্বনার জন্য মানুষ যুগে যুগে গান গেয়েছে, আর যতদিন তারা মানুষ থাকবে ততদিন গাইবেও।

জীবন গান ছাড়া চলে না, আবার সূর্য ছাড়াও চলে না জীবন। এখানে গান আরও বেশী চাই, কেননা সূর্য তো আসতে পারে না। দুশো সাতষট্টি নম্বরের সেল উত্তর দিকে মুখিয়ে আছে, শুধু গ্রীষ্মকালে ডুবন্ত সূর্যের শেষ আভা আমাদের জানলার গরাদ ছুঁয়ে দিয়ে যায়, পূব দেয়ালে কয়েক মুহূর্তের জন্য চলকে পড়ে। সেই ক্ষণে 'বাবা' উল্‌টানো খাটিয়ার উপর

ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যের সেই ক্ষণিক আগমন দেখে।... এর চাইতে শোকাবহ দৃশ্য আর নেই।

সূর্য! উদার সূর্য তার আলোর ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে দেয়, কত বিস্ময় সে সৃষ্টি করে মানুষের কাছে। কিন্তু ক'জন সে সূর্যের আলো পায়? একদিন সে সবাইকে আলো দেবে, হাঁ, সবার জন্য সে উঠবে আকাশে। আমরা সবাই তার উষ্ণ আলোয় বাঁচবো। হাঁ, একথা জেনেও তো আনন্দ। কিন্তু আর একটা তুচ্ছ জিনিস জানতে চাই—আমাদের দু-জনকে কি সে আর আলো দেবে—আমাদের জন্য কি উঠবে সূর্য?

আমাদের সেল উত্তর দিকে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে মাঝে মাঝে গ্রীষ্মের দিনে আমরা সূর্যাস্ত দেখতে পাই। 'বাবা', আর একবারটি সূর্যোদয় দেখতে কি ইচ্ছেই না করে!

চার

চারশো নম্বর

পুনর্জন্ম—এক বিশেষ ঘটনা। অসাধারণ আর বর্ণনাতীতও বটে। ভাল ঘুমের পর সুন্দর দিনে পৃথিবীকে ভালোই লাগে। পুনর্জন্মের দিন অন্য দিনগুলোর চাইতে সুন্দরঃ মনে হয়, যে ঘুম থেকে জেগে উঠলে, এমন ঘুম বুঝি আর হয় নি। নিজে মনে করতে, জীবনের রঙ্গমঞ্চ তোমার চেনা। কিন্তু এবার পুনর্জন্ম এসে সবগুলো প্রতিফলন যন্ত্র খুলে দিল। আলো ঝরে পড়ল স্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়েঃ হঠাৎ সারা মঞ্চ হয়ে উঠলো আলোয় আলো। তুমি মনে করতে জীবনকে তুমি স্পষ্ট দেখেছ, চিনেছ, কিন্তু পুনর্জন্ম তোমার চোখের কাছে ধরল একই সময়ে দূরবীক্ষণ আর অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এ যেন বসন্ত সমাগমের মতোই। বসন্ত যেমন করে চিরপরিচিত পরিবেশে গোপন সুর খুঁজে পায়—এও যেন তেমনি আকস্মিক।

এখানেও তোমার সে-উপলব্ধি আসে, কিন্তু সে তো মুহূর্তের জন্য। প্যানক্রাটস্‌-এর সেলের মতো পরিবেশেও সে আসে বই কি।

অবশেষে একদিন ওরা তোমাকে নিয়ে যায় বাইরের জগতে। ওরা তোমাকে শুনানীর জন্য নিয়ে যায়। কিন্তু স্ট্রেচার নেই। তোমার কাছে অসম্ভব বলেই মনে হয়, কিন্তু সেখানে পৌঁছানো তো সম্ভব। বারান্দা রেলিং-ঘেরা, সিঁড়িতে রেলিং; বুকে ভর দিয়ে চলেছ, হেঁটে নয়। নিচে কয়েদখানার সাঙাৎরা তোমাকে হাতে হাতে নিয়ে জেলের বাসে তুলে দিচ্ছে। তোমরা জন দশবারো লোক বসে আছ একটা অন্ধকার সেলে। সেলটা সহজে এখান থেকে ওখানে নিয়ে যাওয়া চলে। নতুন মুখের সার হাসছে, তুমি হেসে উত্তর দিচ্ছ। কে যেন ফিসফিসিয়ে কি বলছে। তুমি বুঝতে পারছ না লোকটা কে; কার হাত যেন মুঠোয় চেপে ধরলে, কার হাত জান না। বাস এবার জোরে মোড় ঘুরে পেটচেক বিল্ডিং-এর উঠোনে ঢুকে পড়ছে। তোমার নতুন সাঙাৎরা নামাল তোমাকে। একটা বড় ঘরে এসে ঢুকলে। দেয়ালগুলো ফাঁকা, পাঁচ সার বেঞ্চি পাতা। বেঞ্চির উপর বসে আছে লোকগুলো। যেন তৈরী হয়ে আছে এমনি ভঙ্গী। হাত দুখানা হাঁটুর উপর যেন জমে গেছে, ফাঁকা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে অপলকে।... এটা কি জানো? তোমার নতুন জীবনের একটুকরো—একে ওরা বলে 'ছবিঘর'। এরই পর্দায় তোমার জীবনকে বার বার দেখবে, সমালোচনা করবে।

মে—১৯৪৩

পয়লা মে উনিশশো তেতাল্লিশ সালঃ একটু বিরাম মিলেছে, তাই লেখবার পেয়েছি সুযোগ। কি সৌভাগ্য—আবার মুহূর্তের জন্য আমি কমিউনিস্ট সম্পাদক, মে-প্যারেডের উপর লিখছি। লিখছি নতুন পৃথিবীর সামরিক শক্তির কথা।

দোলানো ঝান্ডার কথা আশা কোরো না, না, না, তা নয়। কোনও উত্তেজক ঘটনার কথাও বলতে পারব না, ঐ সবই তো লোকে শুনতে চায়। তার চাইতে অনেক সরল সহজ ব্যাপার। হাজার হাজার শোভাযাত্রীর বিস্ফোরক ঢেউ এখানে নেই। প্রাহার পথে পথে বছরের পর বছরের পয়লা মে-তে তো তাদের দেখা যায়। মস্কোর রেড স্কোয়ারে দেখেছি লাখো লাখো মানুষের অপূর্ব সমুদ্র, তাও এখানে নেই। এখানে লাখো মানুষ তো দূরের কথা, একশই হবে না। শুধু মাত্র কয়েকজন সাথী। তবুও এদের মূল্য কম বলে তো মনে হবে না। এতো এক নতুন শক্তির সমাবেশ, এরা ভীষণ অগ্নিশুদ্ধিতে ছাই হয়ে যায়নি, বরং ইস্পাতের দৃঢ়তা পেয়েছে। এ যেন যুদ্ধক্ষেত্রের ট্রেঞ্চে সমাবেশ, আমরা সামরিক ধূসর পোশাক পরে এসে দাঁড়িয়েছি।

পরীক্ষা চলেছে খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে; যারা যুদ্ধের হাঁপরের ভিতর দিয়ে না গেছে, তারা বুঝি পড়লেও বুঝতে পারবে না।

আমাদের পাশাপাশি সেল থেকে পাচ্ছি প্রভাতী সম্ভাষণ। আঙুলের টোকায় ঝরে পড়ছে বীঠোফেনের একটা সুর। আজ যেন টোকা আরও জোরালো, উৎসবের উন্মত্ত আমেজে ভরা। দেয়ালগুলো যেন চড়া সুরে কথা কইছে।

আমাদের সবচাইতে ভালো পোশাক পরেছি। সব সেলেই এক ব্যাপার।

প্রাতরাশ বেশ জাঁকজমক করে সাঙ্গ হয়েছে। ওয়ার্ডাররা সেলের খোলা দরজার সামনে কালো কফি, রুটি আর জল নিয়ে ছুটাছুটি করছে। কমরেড স্কোরেপা দুটোর বদলে তিনটে রুটি দিয়ে গেল। তার মে দিনের উপহার। সাবধানী আত্মার উপহার, নিজের অনুভূতি প্রকাশের এই সোজা পথই সে খুঁজে পেয়েছে। রুটি নিতে গিয়ে হাত ছুঁলাম, আলতোভাবে চাপ পড়ছে। কথা বলবার তো সাহস নেই—এমন কি চোখের অভিব্যক্তির উপরও পাহারা বসেছে। কিন্তু বোবারা তো আঙুলের সাহায্যে স্পষ্ট কথা কইতে পারে।

আমাদের জানালার নিচে মেয়ে কয়েদীরা ছুটছে ব্যায়াম করতে। আমি টেবিলে উঠে গরাদের ভিতর দিয়ে দেখছি। ওরা হয়ত উপর দিকে তাকাবে। হাঁ, তাকাচ্ছে। আমাকে দেখে মুঠো-করা হাত তুলে জানাল সেলাম। আবার।

উঠোনটা যেন সজীব হয়ে উঠেছে—অন্য দিনের চাইতে আনন্দময় বই কি। রক্ষীরা দেখছে না—হয়তো দেখবার ইচ্ছেও নেই। মে-ডে প্যারেডের এও অঙ্গবিশেষ।

এবার আমাদের পালা, ব্যায়ামের সময় আমাকেই নেতৃত্ব করতে হোল। সাঙাৎরা, আজ পয়লা মে। আজ নতুন কিছু দিয়ে শুরু করা যাক—রক্ষীরা দেখুক আর না দেখুক আমরা গ্রাহ্য করি না। প্রথম খেলা, হাতুড়ী পেটানো—এক, দুই, তিন। দ্বিতীয় শস্য কাটা। হাতুড়ী আর কাস্তে—হাঁ, ওরা এবার বুঝতে পারছে। সারের সবার মুখে হাসি, তাদের প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে জেগেছে উদ্দীপনা। এই আমার পয়লা মে-র উৎসব, এই মূক অভিনয় আমাদের পয়লা মে-র শপথঃ আমরা মৃত্যুতেও হব অটল।

আবার সেলে ফিরেছি। ক্রেমলিনের ঘড়ীঘরে এখন দশটা, রেড স্কোয়ারে প্যারেড শুরু হয়েছে। বাবা, এস, এস। ওরা ইণ্টারন্যাশনাল গাইছে। পৃথিবীর চারদিকে ইণ্টারন্যাশনালের ধ্বনী; আমাদের সেলেও সে সুর বেজে উঠুক। আমরা গাইছি, একের পর এক বিপ্লবী সঙ্গীত সুরু হয়েছে। নিঃসঙ্গ থাকতে আমরা চাই না—আর একাও তো আমরা নই। যারা পৃথিবীতে বিপ্লবের গান মুক্তকণ্ঠে গাইতে পারে, আমরা তো তাদেরই দলে। ওরা তো লড়াই করছে আমাদেরই মতো ...

হে কারাগারের বন্দী সাথীরা
উদ্ধত দেয়ালের আড়ালে তোমরা,
তবু তো তোমরা আমাদেরই, আমাদেরই—
আমাদের যাত্রাপথে চলার তালে তালে
পা পড়ছে না তোমাদের—
তবু তোমরা আমাদেরই।

হাঁ, তোমাদেরই সঙ্গী আমরা।

দুশো সাতষট্টি নম্বর সেলে ১৯৪৩ সালের মে দিনের উৎসব শেষ হোল। কিন্তু এ তো শেষ নয়। মেয়েদের ওয়ার্ডের মেট উঠোনে পায়চারী করছেঃ লাল ফৌজের জয়যাত্রার সঙ্গীত শিস দিয়ে গাইছে। এবার গাইল পার্তিজাংকা আর অন্যান্য সোভিয়েট গান। পুরুষদের সেলে সেলে প্রেরণা জোগাচ্ছে। চেক পুলিসের উর্দিপরা লোকটি আমাকে কাগজ আর পেন্সিল এনে দিয়েছে। আমার লেখার সময় কেউ এসে না পড়ে তাই পাহারাও দিচ্ছে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। আর একজন চেক প্রহরী আমাকে লিখতে উৎসাহ জুগিয়েছে। লেখা হয়ে গেলে সে কাগজগুলো নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে। যখন সময় আসবে তখন ছাপানো হবে। এই কাগজের টুকরোর জন্য তার

মাথা কাটা যেতে পারে, তবু সে জীবন বিপন্ন করে আজকের কারাপ্রাচীরের অন্তরাল আর আগামীর স্বাধীনতার ব্যবধানের ভিতরে কাগজের সেতু রচনা করছে। সবাই একই লড়াই লড়ছে—অসীম সাহসে, তা সে যেখানেই থাকুক না কেন, যা-ই হোক না কেন তাদের হাতিয়ার। এখানে তারা অতি সরল, কোন আড়ম্বর নেই; এমন কি দুঃখও নেই। তোমার কখনও মনে হবে না যে এ মরণপণ যুদ্ধ।

দশবার, বিশবার বিপ্লবী বাহিনীর মে-ডে প্যারেড তোমরা দেখেছ। চমৎকার সে প্যারেড! কিন্তু যুদ্ধেই একমাত্র তোমরা তাদের শক্তির পরিচয় পাবে, বুঝতে পারবে তারা অজেয়। তুমি যা ভেবেছিলে তার চেয়ে মৃত্যু অনেক সহজ, আর বীরত্বের চারদিকে তো জ্যোতির্মণ্ডল নেই। কিন্তু যুদ্ধ তোমার ধারণার চাইতে অনেক নিষ্ঠুর, এখানে টিঁকে থাকতে হলে চাই অসীম শক্তি, তার পরে তো জয়লাভ। তুমি সৈন্যবাহিনীকে বিজয় গর্বে এগিয়ে যেতে দেখছ, কিন্তু কখনও বুঝতে পারনি কতখানি শক্তি তার। তার আঘাত কত সহজ আর ন্যায়সংগত।

আজ বুঝতে পারছ।

হাঁ, ১৯৪৩ সালেই এই মে-ডে প্যারেডে।

পয়লা মে, ১৯৪৩ সাল, আমার কাহিনীর স্রোতে মুহূর্তের জন্য বাধা সৃষ্টি হয়েছে। হাঁ, তা তো হবেই। উৎসবের দিনে মানুষের মনের সুর তো আলাদা হবেই। আর আজকের আনন্দের উপলব্ধি হয় তো আমার স্মৃতিকে খানিকটা আবছা করেও দিতে পারে।

পেটচেক বিল্ডিং-এর 'ছবিঘর'টি নিশ্চয়ই উপভোগের বস্তু নয়। এটি উৎপীড়ন গৃহের প্রবেশদ্বার, এখান থেকেই তুমি চিৎকার আর গোঙানি শুনতে পাবে, ভাববে,—কি আছে তোমার ভাগ্যে কে জানে। দেখবে, শক্ত-সমর্থ মানুষ এখানে ঢুকছে; দু-তিন ঘণ্টা পরে তারা ফিরে এল একেবারে ভেঙেচুরে। ঢোকার সময় এক উদ্দীপ্ত স্বর বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিল—সে-ই ফিরে এল, গলা তখন তার ব্যথায় বুজে এসেছে, জ্বরার্ত, ভগ্ন সে। কখনও বা তার চাইতেও খারাপ অবস্থা চোখে পড়ে। দুটি সজাগ চোখ তোমার দিকে সহজভাবে তাকিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে, ফিরে যখন এল তখন আর মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। উৎপীড়ন গৃহে হয়তো ক্ষণিকের জন্য এসেছিল দুর্বলতা, ভয় আর অব্যবস্থিত ভাব এসেছিল ঘনিয়ে। হয়তো নিজেকে বাঁচাবার দুর্দম ইচ্ছা বসেছিল চেপে। তার মানে কাল তারা এক নূতন শিকার নিয়ে আসবে। আবার ভীষণতার মধ্য দিয়ে শুরু হবে তাদের জীবন। তাদের সাথী শত্রুর কাছে তাদের ধরিয়ে দিয়েছে যে।

কেউ তার সাহস আর বিবেক হারিয়েছে—সে দৃশ্য তো ভয়ংকর। কারো পঙ্গু দেহ দেখলে বুঝি অতটা খারাপ লাগে না। যদি মরণ (এখানে তো তার আনাগোনা আছেই) এসে তোমার চোখ দুটো বুজিয়ে দেয়, তখন বুঝতে পারবে, কে গুপ্ত অভিসন্ধির জাল বুনছে; পুনর্জন্ম যদি তোমার ইন্দ্রিয়-গুলো সজীব করে তোলে, তখন বুঝবে কে দুলছে সন্দেহ দোলায়, কে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, কে এক মুহূর্তের জন্যও মনে ভেঙে পড়ার চিন্তা স্থান দিচ্ছে, কে বলতে চাইছে তার সঙ্গীদের কথা—যারা এমনি করে দুর্বল হয়ে পড়ে তারা তো করুণার বস্তু। কমরেডের জীবন দিয়ে পাওয়া জীবন তারা কেমন করে কাটাবে?

প্রথম যে দিন 'ছবিঘরে' এসে বসেছিলাম তখন হয় তো এ চিন্তা আসেনি, কিন্তু এখন তো এই চিন্তাই ফিরে ফিরে আসে। সেদিন ভোরে আলাদা পরিবেশেও এই চিন্তাই এল। চারশো নম্বরের সেই ঘরে, উপলব্ধির সেই কূপে এল চিন্তা।

বেশিক্ষণ বসিনি 'ছবিঘরে', ঘণ্টা খানেক বা দেড় ঘণ্টা হবে। পেছন থেকে কে নাম ধরে ডাকল। দুই জন বেসামরিক লোক আমার ভার নিল। চেক ভাষায় তারা কথা কইছিল। তারা আমাকে লিফ্‌টে চড়িয়ে পাঁচতলায় একটা বড় ঘরে নিয়ে এল। দোরে লেখা চারশো নম্বর।

প্রথমে একাই বসে রইলাম দেয়ালের কাছে একটা চেয়ারে। চারদিকে তাকালাম । এক অদ্ভুত অনুভূতি। মনে হোল এমনি অনুভূতির ভিতর দিয়ে আগেও কাটিয়েছি। আগে কখনও এখানে এসেছি? না, কখনও না। কিন্তু সবই তো পরিচিত। এই ঘর আমি চিনি, জ্বরের ঘোরে নিষ্ঠুর স্বপ্নে দেখেছি এই ঘর—আমার কাছে সে বিকৃত বিরক্তিকর রূপ নিয়েই দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তবু তো চিনতে কষ্ট হচ্ছে না। এখন তো দিনের পূর্ণ আলোয় ঝলমল করছে, সুন্দর দেখাচ্ছে, রঙ ফুটে উঠছে স্পষ্ট। টাইন গির্জা, লেটনার সবুজ উদ্যান আর প্রাসাদ বড় জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। আমার স্বপ্নের ঘর ছিল আঁধার, জানালাহীন, রং তার ম্লান-হলদে, সেখানে মানুষ-গুলোকে ছায়া বলেই ভ্রম হয়। হাঁ, মানুষ ছিলো বইকি ঘরে। এখন তো ফাঁকা। একটার পিছনে একটা—এমনি ছটা বেঞ্চ। যেন ড্যানডেলিয়ান আর বাটারকাপের ফুলে ফুলে হলদে প্রান্তর। স্বপ্নে এখানে বহু লোকের ভিড়। বেঞ্চে গায়ে গায়ে লেগে বসে আছে। তাদের ম্লান রক্তাক্ত মুখ। দরজার কাছে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, চোখে উৎপীড়নের ছায়া। মজুরের নীল পোশাক পরনে। জল খেতে চাইছে... উদগ্র পিপাসায়। এবার সে লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়, যেন যবনিকা পড়লো।

হাঁ, এই দেখেছিলাম, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি স্বপ্ন সে নয়। সেই প্রলাপময় স্বপ্ন ঘটেছিল বাস্তবে।

আমার গ্রেফ্‌তারের প্রথম রাতে, প্রথম শুনানির সময় ঘটেছিল এই ব্যাপার। ওরা আমাকে এখানে তিনবার নিয়ে এল—বোধ হয় দশবারও হতে পারে—কি করে জানব—কখন তারা কাকে রেহাই দেবে।

আমার খালি পা, ফুলে-ওঠা পা কেমন জুড়িয়ে যাচ্ছিল টালির ঠাণ্ডা মেঝেয়।

বেঞ্চিগুলো সেদিন ছিল জাংকার কারখানার মজুরে ভরতি, তারা গেস্টাপোদের সেদিনকার সান্ধ্য শিকার। নীল জোব্বাপরা যে লোকটি দরজার কাছে ছিল, সে কমরেড বার্টন, জাংকারের পার্টি সেলের একজন। আমার গ্রেফ্‌তারের পরোক্ষ কারণ সে। আমার এই অদৃষ্টের জন্য কাউকে দোষী করা হবে এ আমি চাই না বলেই বলতে হচ্ছে, আমার সংগীদের ভীরুতা বা বিশ্বাসঘাতকতায় আমি ধরা পড়িনি, বরং অসাবধানতা আর মন্দ অদৃষ্টই তার কারণ। প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতাদের সংগে তার সেলের যোগাযোগ স্থাপন করতে চাইছিলেন কমরেড বার্টন। তার বন্ধু কমরেড জেলিনেক গোপন আন্দোলনের নীতি ভেঙে রাজী হলেন যোগাযোগ করে দিতে। আমাকে সোজাসুজি উপর থেকে নিচে যোগাযোগ করে দিতে বলেননি। হাঁ, এ একটা ভুল। দ্বিতীয় কারণ, ডোরাক নামে এক গোয়েন্দা কমরেড বার্টনের কাছ থেকে কি করে জেলিনেকের নাম জানতে পারে। তাই জেলিনেক পরিবার গেস্টাপোর হাতে পড়লো; একটা বড় ব্যাপারে ধরা পড়ল না—অথচ দু'বছর ধরে বড় বড় ব্যাপারে বিশ্বস্তভাবে তারা কাজ করছে। আজ গুপ্ত আন্দোলনের নীতি বহির্ভূত একটা সামান্য কাজে তারা ধরা পড়ল। আমি যে সন্ধ্যায় ওখানে যাই, ঠিক সেই দিনই ওরা পেটচেক বিল্ডিং-এ পরামর্শ করে ঠিক করে যে সন্ধ্যাতেই জেলিনেকদের ধরবে। ওখানে গিয়ে দলবলকে পেলো, সে তো দৈবদুর্ঘটনা। এভাবে কিছু ঠিক ছিল না; জেলিনেকদের ধরা হোত পরের দিন। কিন্তু জাংকার সেলের সভ্যদের পাকড়াও করে গেস্টাপোরা তখন উৎসাহে উদ্দীপ্ত। তারা ছুটলো জেলিনেকদের জন্য। শুধু একটু ফুর্তি তাদের উদ্দেশ্য। আমাকে সেখানে পেয়ে ওদের তাক লেগে গেল। আমাদের থেকেও ওরা অবাক হোল বেশি। কাকে ধরেছে, সে কথাও ওরা জানত না। হয়তো কখনও জানতো না, কিন্তু ঠিক সেই দিনেই তারা ...

চারশো নম্বরে বসে ভাবছিলাম। আমার ভাবনা বহুক্ষণ পরে পেল সংগতি। এখন আমি আর একা নই, বেঞ্চগুলো ভরে গেছে, একসার দেয়ালের চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে। সময় দ্রুত চলছে, আসছে বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

কতকগুলো এত অদ্ভুত যে বুঝতে পারলাম না; কতকগুলো কুৎসিত, বেশ বুঝতেও পারছি।

প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কিন্তু অদ্ভুত বা কুশ্রী অনুভূতি নিয়ে এল না। তাতে ছিল সহৃদয়তা—এমন কিছু ব্যাপারও নয়, তবু কখনও ভুলব না। গেস্টাপোর যে চরটি আমাকে নজরে রাখছিল—মনে পড়েছে গ্রেফ্তারের পর সে-ই আমার পকেট উলটে পালটে দেখে—সেই কি না একটা আধপোড়া সিগারেট দিল। তিন হপ্তা পরে এই প্রথম সিগারেট। তুলে নেব? না, ও ভাববে আমাকে একটা সিগারেট দিয়ে কিনে নিয়েছে? কিন্তু ওর চোখের দৃষ্টি তো সরল; ও কাউকে কিনে নিতে চায় না। তবুও শেষ অবধি টানতে পারলাম না। নবজাতকরা তো আর তেমন পাকা ধূম্রপায়ী নয়।

দ্বিতীয় বিস্ময়—চারজন লোক সামরিক কেতায় পা ফেলে ঘরে ঢুকে চেক ভাষায় উপস্থিত সবাইকে সম্ভাষণ জানালো। আমিও বাদ পড়িনি। টেবিলের ওপাশে তারা বসে কাগজপত্র রাখল, আরাম করে ধরাল সিগারেট, যেন তারা ক'জন উপরওয়ালা কর্মচারী। কিন্তু আমি তো ওদের চিনি, অন্তত তিনজনকে তো বটেই—তারা গেস্টাপো বিভাগে আছে এ কি সম্ভব? হয়তো তাই—কিন্তু তাদের মত লোকও? ঐ তো টেরিঙল বা রেনেক, ওকে ঐ নামেই তো আমরা ডাকি; ইউনিয়ন আর পার্টির বহুদিন সেক্রেটারী ছিল। কেমন একটু উচ্ছৃংখল, কিন্তু বিশ্বাসী। না, এ অসম্ভব! ঐ তো আনকা ভিকোভা, তেমনি ঋজু, তেমনি সুন্দর, যদিও চুল তা সাদা হয়ে গেছে। সে ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোদ্ধাদের একজন—না, না এ অসম্ভব! ঐ যে ভাসেক রেজেক, উত্তর বোহেমিয়ার খনি অঞ্চলের মিস্ত্রী, পার্টির জেলা-সেক্রেটারী হোল—ওকে আমি নিশ্চয়ই চিনি। উত্তর অঞ্চলে যে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে আমরা এলাম, তারপরে কি করে ওর শিরদাঁড়া ভাঙল? না, না অসম্ভব! কিন্তু ওরা এখানে কি করছে? কি চায় ওরা?

প্রশ্নের উত্তর পেলাম না খুঁজে, এবার আর সবাই এসে হাজির। মিরকা, জেলিনেক আর ফ্রিডদম্পতিকে ওরা এনেছে,—হাঁ, আমার সঙ্গেই ওরা গ্রেফ্তার হয়েছে তা জানি। কিন্তু পাভেল ক্রোপাচেক কেন এখানে? শিল্প-ঐতিহাসিক তিনি, মিরেককে বুদ্ধিজীবীদের ভিতরে কাজে সহায়তা করছিলেন। আর ঐ থেতলানো মুখ লম্বা ছোকরাটি কে? ও তো আমাকে চিনতে চায় না এমনি ভাব দেখাচ্ছে। ওকে আমি সত্যিই চিনি না। কে, কে ও? আরে স্টাইখ যে! স্টাইখ? ডাক্তার ঝেনেক স্টাইখ? হা ভগবান! ওরা কি তাহলে ডাক্তারদের বিভাগেও হানা দিয়েছে। কিন্তু মিরেক আর আমি ছাড়া কে ওদের চিনত? ওরা উৎপীড়নের সময় কেনই বা বুদ্ধি-জীবীদের কথা জিজ্ঞেস করছিল? বুদ্ধিজীবীদের ভিতর কাজ করেছি,

এ সম্বন্ধে ওরা জানলো কি করে? মিরেক আর আমি ছাড়া এ ব্যাপার আর কে জানত?

উত্তর খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু এ তো প্রকাণ্ড আঘাত—মিরেক নিশ্চয়ই বলেছে, আমাদের সবাইকে ধরিয়ে দিয়েছে। ক্ষণেকের জন্য আশা হোল, মিরেক হয়তো সব বলেনি। কিন্তু কিছু পরেই ওরা আর একদল বন্দী এনে হাজির করল। এবার বুঝতে পারলাম সে কি করেছে!

জাতীয় বিপ্লবী দলে যে সব চেক বুদ্ধিজীবী ছিল তাদের কেউ বাদ পড়েনিঃ লেখক ভ্লাদিমির ভাঞ্চুরা; অধ্যাপক ফেলবার আর তার ছেলে; বেডরিখ ভাকলাভেক ছদ্মবেশে তাকে চেনা যায় না। বঝেনা পালপানোভা, জিনড্রিখ এলব্ল আর স্থপতি ডোরাক। মিরেক নিশ্চয়ই এদের মধ্যে কাজের কথা সবই বলেছে।

পেটচেক বিল্ডিং-এর প্রথম অভিজ্ঞতা আমার কাছে আরামের মনে হয়নি, কিন্তু এ আঘাত যে ভীষণ হয়ে দেখা দিয়েছে, সইতে পারছি না। আমি আশা করেছিলাম মৃত্যু, বিশ্বাসঘাতকতা নয়। সহৃদয় ভাবে বিচার করতে বসলাম তাকে, তার সম্বন্ধে উঁচু ধারণাই আছে। মনে মনে বললাম, না মিরেক একাজ করেনি, তবু একই উত্তর এল। বিশ্বাসঘাতকতা সে করেছে। না, না এ দোলায়মান চিত্তবৃত্তি বা দুর্বলতা নয়, উৎপীড়নে মুমূর্ষু মানুষের জ্বরার্ত স্খলনও নয়। এগুলো তো ক্ষমা করা যায়। এখন বুঝলাম, ওরা প্রথম রাতেই কি করে আমার নাম জেনেছিল। বুঝলাম, কেন অ্যানি জিরাস্কোভা এখানে। মিরেককে কবার তার বাড়ীতে দেখেছিলাম। এখন জানলাম, কেন ক্রোপাচেক আর ডাঃ স্টাইখ এখানে।

তারপর প্রায় রোজই ওরা চারশো নম্বরে নিয়ে যেত। রোজই নতুন নতুন আবিষ্কার। শোকাবহ আর ভয়ংকর সে আবিষ্কার। এই সেই সাহসী বীর; স্পেনের সীমান্তে লড়েছে, বুলেটের ভয় করেনি, ফ্রান্সের বন্দীশিবিরের উৎপীড়নে কখনও মাথা নোয়ায়নি। আর আজ গেস্টাপোর চাবুকের সামনে সে ভয়ে ম্লান হয়ে গেল, নিজেকে বাঁচাবার জন্য আমাদের ধরিয়ে দিল! কত জোলো তার সাহস আর বিশ্বাস—সামান্য ক'ঘা আঘাত এড়াবার জন্য ভেঙে যায়! একই আদর্শে বিশ্বাসী কমরেড পরিবৃত হয়ে সে ছিল শক্তিমান। তাদের কথা ভেবে সে দেহে পেত শক্তি। কিন্তু যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো, যখন সে একা শত্রুর ভিতরে, তার শক্তি তখন একেবারে হারাল। নিজের কথা ভাবতে গিয়ে সে হারাল সব কিছু। নিজেকে বাঁচাবার জন্য সে বলি দিল তার সাথীদের। ভীরুতার কাছে স্বীকার করল বশ্যতা—আর ভীরুতা নিয়ে এল বিশ্বাসঘাতকতা।

সে ভুলে গেল, তার ঘরে পাওয়া কাগজপত্রের সাংকেতিক লিপির পাঠোদ্ধারের চাইতে মৃত্যুও ভালো। সে একটি একটি করে সব বলে দিল। নাম, কোথায় তাদের গুপ্তধাম, সে সব বলে দিল। একজন গেস্টাপো চর নিয়ে সে স্টাইখের সঙ্গে গেল দেখা করতে। ডোরাকের বাড়ীতে পাঠাল পুলিস। সেখানে ভাক্লাভেক আর ক্রোপাচেকের দেখা করার কথা ছিল। অ্যানিকে সে তুলে দিল তাদের হাতে। যে তাকে ভালোবাসত সেই সাহসিকা লীডাকেও সে ধরিয়ে দিল। কয়েক ঘার ওয়াশ্‌তা, তারপর সে যা জানত তার অর্ধেক ফাঁস করে দিল। যখন ভাবল আমি মরে গেছি, কারও কাছে আর জবাবদিহি করতে হবে না, সে বাকীটুকু বলতেও দ্বিধা করল না।

আমার ক্ষতি সে করতে পারেনি। আমি তো তখন গেস্টাপোর হাতে—আর কি ক্ষতি আমার হতে পারে? কিন্তু তার জবানবন্দীতে তদন্তের ভিত্তি সৃষ্টি হোল, প্রমাণ পেল ওরা, আর তাতে আমিও জড়িয়ে পড়লাম। এমন সব কথা সে ফাঁস করে দিল যা শুনে ওরা খুব খুশি। আমি কি এই জন্যই সামরিক আইনের সময় বেঁচে ছিলাম? ও আর আমি চলে গেলে আমাদের দল টিকত না। কিন্তু ও যদি মুখ বুজে থাকত, অন্য দলগুলো তো টিকত, আমাদের মৃত্যুর বহু পরেও তারা কাজ করতে পারত!

ভীরু যে সে তো শুধু তার নিজের জীবনই হারায় না, আরও অনেক কিছু হারায়। এই তো এই ভীরু লোকটা, এক মহান সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে এসে অতি নীচ শত্রুর পায়ে নিজেকে সমর্পণ করল। যদিও সে বেঁচে আছে, কিন্তু সে তো মৃত। তার দল থেকে সে বহিষ্কৃত। পরে সে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাকে আর গ্রহণ করা হয় নি। এই বহিষ্কারের স্মৃতি তো কয়েদখানায় আরও ভীষণ হয়ে দেখা দেয়।

বন্দীজীবন আর নিঃসঙ্গতা সব যেন এক হয়ে আছে মানুষের মনে। কিন্তু সে তো মস্ত ভুল। বন্দী তো একা নয়। কয়েদখানা তো এক গোষ্ঠী, কঠোর মেয়াদেও মানুষ কখনও দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে না—অবশ্য সে যদি নিজে সরে না দাঁড়ায়। দাসদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন নিষ্পেষিত হয়ে আরও শক্ত হয়ে উঠে, প্রগাঢ় হয়। উত্তেজনা জোগায়। দেয়াল ভেদ করে সে চলে যায়, বেঁচে ওঠে, কথা কয়, টোকায় ঝরে পড়ে সংকেত। প্রতি ওয়ার্ডের সেলগুলো ভ্রাতৃত্বের আলিঙ্গনে ধরা দেয়। তাদের কর্তব্য এক, দুশ্চিন্তাও এক, একই রক্ষীরা তাদের পাহারা দেয়, ব্যায়ামচর্চার সময়ে তারা সবাই খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। যখন বাইরে দেখা হয়, একটি কথা, একটি ভঙ্গীই খবর দেওয়া বা কারও জীবন রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। ভ্রাতৃত্ব বন্দীদের একসূত্রে বাঁধে। ওরা এক সঙ্গে যায় শুনানিতে, 'ছবিঘরে', আবার একই সঙ্গে ফিরে আসে। এ ভ্রাতৃত্বে কথা সামান্যই, কিন্তু কাজ হয় ঢের বেশী।

মুহূর্তের জন্য হাত চেপে ধরা বা একটা সিগারেট দেওয়া—এইমাত্র। কিন্তু এক লহমার এই ঘটনা তো তোমার খাঁচায় চিড় ধরিয়ে দিতে পারে এবং যে নিঃসঙ্গতা তোমাকে ধ্বংস করে দিতে চাইছিল, তার থেকে দিতে পারে মুক্তি। সেলগুলোর হাত আছে, যখন উৎপীড়িত হয়ে ফিরে এলে তখন অনুভব করবে তুমি যাতে পড়ে না যাও তাই তারা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। উপবাসে যখন ওরা তোমাকে মারবার চেষ্টা করছে, তখন সেই তো তোমার মুখে তুলে দেবে খাবার। সেলগুলোর চোখও আছে, যখন তুমি মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করবার জন্য চলেছ, তখন সে চোখের দৃষ্টি তুমি অনুভব করবে। তোমাকে যোদ্ধা হয়ে চলতে হবে, তুমি যে তাদের ভাই। টলে টলে চলে ওদের দুর্বল করে দিতে তো তুমি পারবে না। এ ভ্রাতৃত্ব ক্ষত বিক্ষত, রক্ত ঝরছে, কিন্তু সে তো অজেয়। তার সাহায্য ছাড়া তুমি তো তোমার বোঝা বইতে পারতে না। শুধু তুমি নও, কেউই পারত না।

যদি কাহিনী বলা সম্ভব হয় (আমরা তো দিন আর ঘণ্টার হিসেব জানি না) এই চারশো নম্বর প্রায়ই এসে হাজির হবে আমার কাহিনীতে, যেমনটি সে এই পরিচ্ছেদের শিরোভাগে এসে হাজির হয়েছে। প্রথম তো একে একটা কুঠরী বলেই ভাবতাম। প্রথম দিনের স্মৃতিও তো সুখের নয়। কিন্তু এতো কুঠরী নয়, এক সংঘবদ্ধ স্থিরপ্রতিজ্ঞ জংগী দল, সুখীও বটে।

১৯৪০ সালে যখন গেস্টাপোর কমিউনিস্ট-বিরোধী বিভাগের কাজ বেড়ে যায়, তখনই এই চারশো নম্বরের সৃষ্টি। স্থানীয় কয়েদ বিভাগের কমিউনিস্ট-বিরোধী শাখা, কমিউনিস্টদের প্রতীক্ষাগৃহও বলা যায়। গেস্টাপো কর্তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য যাতে বার বার দোতালা থেকে চারতলায় দৌড় করাতে না হয় তাই এটি তৈরী হয়েছে। তারা ভেবেছিল, এতে কাজের সুবিধে হবে।

দুজন কয়েদীকে তুমি এক জায়গায় রাখ, দেখবে পাঁচ মিনিটের ভিতরেই এক সংঘ গড়ে উঠেছে, বিশেষতঃ তারা যদি কমিউনিস্ট হয় তা'হলে তো কথাই নেই। আর এই সংঘ তোমার সব কাজের খসড়া ভেস্তে দেবার চেষ্টা করছে। ১৯৪২ সালে 'ছবিঘরে'র নামকরণ হোল, কমিউনিস্টদের কেন্দ্রীয় পরিষদ, বহু পরিবর্তনও ঘটল। হাজার হাজার কমরেড, পুরুষ, আর নারী, যখন যাদের পালা এল এই ঘরে, বেঞ্চে এসে বসল। কিন্তু একটা পরিবর্তন হোল না—যে সংঘশক্তি সংগ্রামে নিবেদিত হয়েছিল, শেষ জয়লাভে সুনিশ্চয় হয়েছিল—সে তো রইল অটুট।

চারশো নম্বর যুদ্ধক্ষেত্রের একেবারে পুরোভাগের ট্রেঞ্চ। যেন চারদিকে শত্রু ঘিরে আছে, গুলী বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু তবু কেউ ভাবছে না আত্মসমর্পনের

কথা। এখানে লাল ঝাণ্ডা উড়ছে সগর্বে। এই সংঘশক্তি প্রকাশ করছে সমগ্র জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের একতা।

আসল 'ছবিঘরে' শুধু বুট-পরা এস্-এস্ পায়চারি করে, তুমি একবার চোখ টিপলেই তারা চেঁচিয়ে ওঠে। উপরে চারশো নম্বরে চেক ইনসপেক্টর আর পুলিস বিভাগের দালালরা সব সময় মোতায়েন হয়ে আছে। এরা কেউ কেউ গেস্টাপো বিভাগে দোভাষীর কাজ করছে স্বেচ্ছায়, কেউবা এসেছে উপরওয়ালার হুকুমে। এরা হুকুম তামিল করছে গেস্টাপো অনুচর নয় তো চেক পুলিস হিসেবে। কখনও বা দুই রূপেই এদের দেখা যায়। হাঁটুর উপর হাত রেখে একেবারে সোজা হয়ে বসে থাকার এখানে প্রয়োজন নেই, সামনের দিকে যে সোজা তাকিয়ে থাকতে হবে তাও নয়। আরাম করেও বসতে পার, চারদিকে তাকানোও চলে, হাতও যেভাবে ইচ্ছে রাখা যায়। তার চাইতে বেশি কিছুও করা যায়—অবশ্য সেটা নির্ভর করে রক্ষীদের উপর। তোমাকে কোন দলটি পাহারা দিচ্ছে, আগে তাই দেখে নিতে হবে।

চারশো নম্বরে বসে তুমি মানুষকে চিনতে পার, সে উপলব্ধি তো গভীর। আসন্ন মৃত্যু প্রতি মানুষকেই নগ্ন করে দেয়। যাদের তদন্ত চলছে এমনি লাল ফিতে হাতে বাঁধা কমিউনিস্ট, অথবা তাদের সহযোগী সন্দেহে যাদের গ্রেফ্‌তার করা হয়েছে, এমন কি আমাদের পাহারা দিতে যাদের রাখা হয়েছে, যারা তদন্তে সাহায্য করছে, এরাও নগ্নতা থেকে বাদ পড়ে নি। অন্য ঘরে যখন উৎপীড়ন চলে কথাই তখন তোমার ঢাল, তোমার হাতিয়ার, কিন্তু এই চারশো নম্বরে কথার আড়ালে লুকিয়ে থাকা চলে না। এখানে ওরা কথার ওজন মানে না, তোমার ভিতরে কি আছে, কি ধাতুতে তুমি গড়া—তাই-ই দেখে। এখন তো তোমার জীবনের সার বস্তুটুকুই আছে। এতদিন তোমাকে যা কিছু সংযত করে রেখেছিল যা কিছু দুর্বল করে দিয়েছিল, তোমার আসল সত্তাকে মহনীয় করে তুলেছিল, মৃত্যুর আগের ঝড়ে সে তো খসে খসে গেল। শুধু রইল কর্তা আর কর্ম; বিশ্বস্ত যে সে জানাচ্ছে প্রতিরোধ, বিশ্বাসঘাতক ভঙ্গ করছে বিশ্বাস, বীর সংগ্রামরত, আর দুর্বল বিরত। আমাদের প্রতিজনের ভিতরে শক্তি আর দুর্বলতা, সাহস আর ভয়, দোলায়মান চিত্তবৃত্তি, পবিত্রতা আর কলুষের খেলা চলছে, কিন্তু এখানে তো দুটো বিরুদ্ধ ভাব নেই—যে কোনও একটা শুধু রয়ে গেছে। হয় হাঁ, নয়তো না। কেউ যদি চালাকি করে দুটো প্রান্তের মাঝখানে থাকতে চায়, সে তো কুখ্যাত হয়ে গেল—যেমন টুপিতে হলদে পালক লাগালে বা শবযাত্রার মিছিলে করতাল বাজালে হয়।

এমনি মানুষ, কয়েদী, চেক ইনস্‌পেক্টর আর গোয়েন্দাদের ভিতরে মিলবে বৈকি। তদন্তের সময় তারা রাইখের অধিষ্ঠাতা দেবতার উদ্দেশ্যে মোম

বাতির অর্ঘ্য দেয়, আর চারশো নম্বরে অর্ঘ্য দেয় বলশেভিক শয়তানের উদ্দেশ্যে। জার্মান কমিশারের সম্মুখে তোমার সংবাদবাহকের নাম বলবার জন্য ওরা ঘুসি মেরে দাঁত ফেলে দিতে পারে; কিন্তু চারশো নম্বরে তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য পেতে পার এক টুকরো রুটি। অনুসন্ধানী দল তোমার বাড়ী থেকে মূল্যবান যা কিছু চুরি করে নেবে, কিন্তু চারশো নম্বরে লুটের ভাগ থেকে তোমার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে ওরাই দেবে আধপোড়া একটা সিগারেট। অন্য ধরনেরও আছে—পয়লা দল থেকে একটু মাত্র তফাৎ—নিজেরা ইচ্ছে করে কখনও আঘাত হানবে না, সাহায্য করতেও যাবে না। নিজেদের বাঁচাবার কথাই তাদের মনে জাগছে, তারা হচ্ছে রাজনীতিক আবহাওয়ার স্পর্শাতুর তাপমান যন্ত্র। যখন তারা রাশভারি, তখন তুমি বলতে পারবে জার্মানরা স্তালিনগ্রাদের দিকে দ্রুত এগোচ্ছে। যখন কথা বলার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে বন্দীদের সঙ্গে, নম্র হয়ে যায়, তখন জানবে স্তালিনগ্রাদে জার্মানরা পরাস্ত হয়েছে। যখন তাদের চেক-পূর্বপুরুষের কথা তুলবে, বা বলবে বাধ্য হয়েই তারা গেস্টাপোদের সঙ্গে ভিড়েছে—তখন তো চমৎকার, বুঝতে হবে লাল ফৌজ এবার রস্টভের উপর বিজয়গর্বে এসে পড়েছে। আর এক ধরনের জীবও আছে। তুমি যখন ডুবছ, এরা পকেটে হাত ডুবিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে, তারপর যখন পারে উঠে এলে তখন হাত বাড়িয়ে দেবে।

এই ধরনের জীবরা চারশো নম্বরের সংঘশক্তি উপলব্ধি করতে পেরে তারই দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়লো। কিন্তু তারা চারশো নম্বরের কেউ তো নয়। আর এক ধরনের জীব আছে, তারা এই সংঘশক্তির কথা জানেই না। এদের আমি বলব খুনে, কিন্তু এরাও মানুষ। এই পশুরা চেক কথা বলে, হাতে থাকে লাঠি বা ডান্ডা, আমাদের উপর এমন অত্যাচার ওরা মাঝে মাঝে করে, যা দেখে জার্মান কমিশাররাও শিউরে উঠে পালিয়ে যায়। নিজেদের জাতি বা রাইখের সভ্যতার মুখোসটুকু বাঁচাবার জন্য পাশবিকতা তারা চেপে রাখতে শেখেনি। তারা উৎপীড়ন আর হত্যায় আনন্দ পায়। আমাদের দাঁত তারা উপড়ে ফেলেছে, কানের পর্দা ছিঁড়ে দিয়েছে, চোখের মণি বার করে ফেলেছে, শুধু নিজেদের নিষ্ঠুরতা পরিতৃপ্তির জন্য আমাদের তলপেটে মেরেছে লাথি, আমাদের মগজের ঘি বার করে দিয়েছে মাথায় মেরে। প্রতিদিন এদের দেখতে পাবে, উপস্থিতি সহ্য করতে হবে। সে তো রক্ত আর আর্ত চিৎকার ভরা। তাদের বিরুদ্ধে তোমার একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় নিজের দৃঢ়বিশ্বাস; হাঁ, তারাও শেষে ন্যায় বিচারের হাত থেকে রেহাই পাবে না, তাদের পাপের শেষ সাক্ষীটিকে খুন করে ফেললেও না।

এই ধরনের জীবের সঙ্গে আর এক দলও আছে, যাদের সত্যিকারের মানুষ না বললে অবিচার করা হয়। যারা কয়েদখানার আইনের বলে কয়েদিদের রক্ষা করে, যারা চারশো নম্বরের এই সংঘ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। তারা তো সর্বান্তঃকরণে এখানকারই, তাদের সাহস একে শক্তি যোগাচ্ছে। তাদের মহত্ব আরও বেশী, কারণ তারা তো কমিউনিস্ট নয়; বরং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চেক পুলিসদের দালাল হিসেবেই তারা কাজ করে এসেছে। কিন্তু আজ সমগ্র জাতির পক্ষে কমিউনিস্টদের প্রয়োজনীয়তা তারা বুঝতে পেরেছে। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে তারা দেখেছে, তাই আমাদের সাহায্য করছে। তারা জানে আমরা কয়েদখানার এই খাটিয়ায় বসে আছি, তবু আমরা এখনও বিশ্বাসী, এখনও খাঁটি।

আমাদের যে সব সৈনিকরা বাইরে আছে, তারা যদি জানতে পারত গেস্টাপোর হাতে পড়লে কি হবে, তাহলে বিচলিত হত বইকি। কিন্তু ভিতরে যে বিশ্বস্ত মানুষরা রয়েছে, তারা তো প্রতিদিন, প্রতিঘণ্টায় প্রত্যক্ষ করছে সেই ভীতি। প্রতি ঘণ্টায় তারা অপেক্ষা করছে, এবার বুঝি এল চরম উৎপীড়ন, কিন্তু তবু টলছে না। তারা হাজার হাজার লোককে রক্ষা করছে, যাদের জীবন বাঁচাতে পারছে না, তাদের দুঃখভার লাঘব করছে। বীরের খেতাব তো তাদেরই। তারা না থাকলে আজ হাজার হাজার কমিউনিস্টের কাছে চারশো নম্বর যে রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে, তা তো সম্ভব হোত নাঃ এ যেন এক অন্ধকার বাড়ীতে এক ফোঁটা আলো, শত্রুর পেছনের ট্রেঞ্চ—আক্রমণকারীর ঘাঁটির ভিতরে আজাদীর লড়াইয়ের এক কেন্দ্র।

পাঁচ

চরিত্র চিত্র—প্রথম পর্যায়

যারা ইতিহাসের এই অধ্যায়ে বেঁচে থাকবে তাদের কাছে আমার একটি অনুরোধঃ এই সংগ্রামে যারা যোগ দিল, তাদের কখনও ভুলে যেও না। ভাল মন্দ সবাইকে মনে রেখো। তোমাদের বা তাদের পক্ষ হয়ে যারা প্রাণ দিল, তাদের সম্বন্ধে যথাসম্ভব তথ্য যোগাড় কর। অবশেষে বর্তমান তো অতীত ইতিহাসে পরিণত হবে; তখন মহান অধ্যায় বলে অভিহিত হবে এই যুগ— আর সেই যুগের ইতিহাস তো গড়ে তুললো এক নামহীন বীরের দল। নাম ওদের সবারই ছিল, ছিল এক একখানি মুখ, আশা আর আকাঙ্খা, যাদের নাম অমর হয়ে থাকবে, তাদের চাইতে এদের তো নির্যাতন কম সইতে হয়নি। তাই আমার অনুরোধ, ওরা যেন তোমার পরিচিত, তোমার পরিবারের একজন, এমনকি তোমার অভিন্ন সত্তা—এমনি করেই ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠ।

বীরের দল নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাদের যে কোন একজনকে বেছে নিয়ে নিজের ছেলে বা মেয়ের মতো ভালবাসোঃ ভবিষ্যত গড়ে তোলবার জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেছে তারা তো মহৎ, তাদের কথা স্মরণ করে গর্ব কর। যারা ভবিষ্যতের ভিতরেই বেঁচে ছিল, তাকে সুন্দর করবার জন্যই প্রাণ দিল, তাদের সে আকৃতি তো পাথরে খোদাই করবারই যোগ্য। আর যারা অতীতের ধুলো দিয়ে বিপ্লবের বন্যার বিরুদ্ধে এক বাঁধ তৈরীর চেষ্টা করেছিল, তারা তো পচা গলা কাঠের পুতুল, তা যতই তাদের কাঁধে পদমর্যাদার সোনালী নিশানা থাক না। কিন্তু এদেরও চিনতে হবে তোমাকে, তাদের বাস্তব পরিচয় পেতে হবে। আর দেখতে হবে তাদের নীচতা, নিষ্ঠুরতা, হাস্যকর অভিব্যক্তি ঃ ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় তারাও যোগাবে আমাদের উপাদান।

নিচে কতকগুলো তথ্য দেওয়া হোল, কিন্তু এগুলো একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। আমি এক সংকীর্ণ সীমার মধ্যে যতটা পেরেছি লিখেছি, তাই পরিপ্রেক্ষিত এখানে নেই বললেও চলে। কতকগুলো চরিত্রের ব্যক্তিগত নির্দেশ মাত্র—তবে এর ভিতরে ছোট বড় সবাই আছে।

জেলিনেকরা

জোসেফ আর মারি। জোসেফ কন্‌ডাক্টর আর মারি এক বাড়িতে ঝি। ওদের ছোট্ট বাড়িটি দেখবার মতো। আধুনিক অনাড়ম্বর আসবাব, একটা বইয়ের তাক, মূর্তি—দেয়ালে ছবি—আর ভারি পরিচ্ছন্ন—যেন ধারণার বাইরে। তুমি দেখেই বলবে, মারির সমস্ত সত্তা যেন এই গৃহকোণে আবদ্ধ, বাইরের পৃথিবীর সে কিছুই জানে না। কিন্তু বহুদিন সে কমিউনিস্ট পার্টিতে কাজ করেছে, স্বপ্ন দেখেছে সাম্যের রাজত্বের। দুজনের তারা একনিষ্ঠ কর্মী, নীরবে কাজ করে গেছে—আক্রমণের সময়ে তাদের উপর চাপ পড়েছে যথেষ্ট তবু পেছিয়ে যায় নি।

তিন বছর তারা ছিল অন্তরালে, তারপর একদিন পুলিস এসে হানা দিল তাদের বাড়ীতে। পাশাপাশি মাথার উপর হাত উচুঁ করে তারা দাঁড়াল—স্বামী আর স্ত্রী—মর্মস্পর্শী সে দৃশ্য।

১৯শে মে, ১৯৪৩

আজ রাতে আমার গাস্তিনাকে ওরা পোল্যাণ্ডে নিয়ে গেল বেগার খাটাতে। নিয়ে গেল দাসত্বের চাকায় বেঁধে দিতে, টাইফয়েডে হবে ওর মৃত্যু। আর তো কয়েক সপ্তাহ বাঁচবে, জোর দুমাস কি তিনমাস হবে। আমার মামলাও এবার আদালতে গেছে। প্যানক্রাটস্‌-এ আরও চার সপ্তাহ জেরা চলবে, শেষের সে দিন আসবে আরও দু-তিন মাস পরে। এই রোজনামচা আর শেষ হবে না। যা পারি, এই কদিনের ভিতরে সুযোগ পেলে লিখে রাখতে চেষ্টা করব। কিন্তু আজ তো লিখতে পারছি না। গাস্তিনা আজ আমার মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। উদার গাস্তিনা, সহানুভূতিপ্রবণ তার মন, এ-জীবনে গভীরতা ছিল বটে, কিন্তু সত্যিকারের শান্তি বলতে যা বোঝায় তা তো পাইনি। অথচ ওর বন্ধুত্ব ছিল এখানে অমূল্য, একনিষ্ঠ।

কত সন্ধ্যায় সে যে-গান ভালোবাসে আমি গাইতাম। স্তেপের নীলাভ তৃণের গান, তৃণদল ফিসফিসিয়ে গাইছে আমাদের এই দলগত সংগ্রামের কথা। কশাক মেয়ের কথাঃ স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম করল, তারপর যুদ্ধ শেষে তাকে আর মাটি থেকে ওরা তুলতে পারল না।

আমার সাহসিকা, আমার সঙ্গিনী, অমন ক্ষুদ্র দেহে, অমন শ্রীময়ী মুখে, কি করে বইছ এত শক্তি! কি কোমলতা ঐ দুই আয়ত শিশুর মতো চোখে! এই অক্লান্ত সংগ্রামে বিরহ এসেছে প্রায়ই, সে আমাদের শাশ্বত প্রেমিক-প্রেমিকা করে তুলেছে। কতশতবার আমরা সেই প্রথম সোহাগ আর মিলনের

মধ্যে বেঁচেছি। এক নাড়ীর স্পন্দন জেগেছে দুই বুকে, একই নিশ্বাস নিয়েছি শান্তি আর উদ্বেগে, উত্তেজনায় আর দুঃখে।

বছরের পর বছর ধরে একসঙ্গে কাজ করেছি, পরস্পরকে সাহায্য করেছি, বন্ধু যেমন বন্ধুকে সাহায্য করে—এও তেমনি। বছরের পর বছর সে ছিল আমার লেখার প্রথম পাঠিকা ও সমালোচক। কখন যে তার দৃষ্টি অনুভব করিনি, একথা বলা শক্ত। বছরের পর বছর আমরা সংগ্রামে দাঁড়িয়েছি পাশাপাশি, আমাদের জীবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। যে দেশকে ভালবাসি তারই মাঝে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়িয়েছি। বহু সংকট গেছে, বহু আনন্দের মুহূর্ত, গরীবের পরম ধনে ধনী তখন আমরা, সে ধন তো ছিল আমাদের অন্তরের অন্তরে।

গাস্তিনা? দেখ, দেখ এই আমার গাস্তিনাঃ

এক বছর আগে সামরিক আইন জুন মাসের মাঝামাঝি জারি হোল। আমাদের গ্রেফতারের দু'সপ্তাহ পরে সে আমাকে প্রথম দেখল—তার আগে দুর্যোগের দিনগুলো সে কাটিয়েছে সেলের নিঃসঙ্গতায়, আমার মৃত্যুর নানা গুজব শুনে। ওকে ওরা ডেকে আনল আমাকে দুর্বল করে দেবার জন্য।

—ওকে বুঝিয়ে বল। বিভাগের কর্তা মুখোমুখি আমাদের বসিয়ে দিয়ে বলল, ওকে বুঝিয়ে বল। নিজের কথা না ভাবুক, অন্তত তোমার কথা ভাবতে বল। একঘণ্টা সময় দিলাম ভাববার। তবু যদি একগুঁয়েমি কর—তা হলে আজ রাতেই গুলী করা হবে। হাঁ দুজনকেই।

সে তার চোখের দৃষ্টি দিয়ে যেন আমাকে আদর করল, চাপড়ে দিল। সরল সহজভাবে উত্তর দিলঃ

'কমিসার, আমাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করো না। আমার শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কামনাঃ ওকে যদি হত্যা করা হয়, আমাকেও তাই করো।'

এই আমার গাস্তিনা—মহতি প্রেম আর শক্তির আকর।

হাঁ, ওরা আমাদের হত্যা করতে পারে, পারে না গাস্তিনা? কিন্তু আমাদের ভালোবাসা বা সম্মান তো আর কেড়ে নিতে পারবে না।

তোমরা কি কল্পনা করতে পার, এই সব পার হয়ে আমরা যদি আবার দেখা পাই—কেমন হবে সে জীবন? আবার দেখা সেই স্বাধীন জীবনে, সেখানে থাকবে সৃষ্টির স্বাধীনতা, কেমন হবে সে জীবন? আমাদের কামনা যখন লাভ করবে সিদ্ধি, আমরা এতদিন যার জন্য ধীরভাবে কাজ করলাম, যার জন্য আজ আমরা প্রাণ দিতে যাচ্ছি—কেমন হবে সেই দিন? তখন আমরা মৃত, তবু আমরা তোমাদের সেই মহা আনন্দের এক কণার ভিতরে বেঁচে উঠব, কেন না এরই জন্য আমরা তো আমাদের জীবন দিলাম। আমাদের তাই তো আনন্দ, যদিও আজ বিদায় বেলায় ব্যথা বাজছে।

কিন্তু ওরা আমাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে দিল না, আলিঙ্গনে বাঁধবার দিল না অবকাশ, এমন কি হাত ধরতেও পর্যন্ত দিল না। শুধু কয়েদখানার পঞ্চায়েত প্যানক্রাট্স্ আর কারলোভো স্কোয়ারের ভিতরে যার যোগাযোগ আছে, সে মাঝে মাঝে এখন জানিয়ে দেয় আমাদের ভাগ্যের কথা। তোমরা বুঝতে পারছ, গাস্তিনা আর আমি জানি, আমাদের আর দেখা হবে না। কিন্তু তবু দূর দূরান্ত থেকে শুনতে পাচ্ছি তোমার স্বর, তুমি ডেকে বলছঃ বিদায় আমার প্রিয়, বিদায়,—যত দিন না দেখা হয়—বিদায়।

হাঁ, যতদিন না দেখা হয় বিদায়!

. .

আমার শেষ উইল

লাইব্রেরীটা ছাড়া আমার আর কিছুই ছিল না। গেস্টাপোরা সেটি নষ্ট করেছে।

আমি সাংস্কৃতিক আর রাজনীতিক নানা সমস্যা মূলক প্রবন্ধ, নাটক আর সাহিত্যের সমালোচনা লিখেছিলাম। বেশীর ভাগই তার সাংবাদিকতা—দিনের সঙ্গেই তার সম্বন্ধ, দিন শেষ হয়ে গেছে, তারও আর মূল্য নেই; কতকগুলো জীবনের সঙ্গে জড়িত! আশা ছিল গাস্তিনা সেগুলো প্রকাশ করবে, কিন্তু এখন তাও নেই। আমি তাই আমার কমরেড লাডিয়া স্টলকে অনুরোধ করছি, তিনি যেন ভালোগুলো বাছাই করে পাঁচখানা বইয়ে ভাগ করে প্রকাশ করেন।

১। রাজনীতিক প্রবন্ধ ও আলোচনা
২। দেশের বিবরণ
৩। সোভিয়েট ইউনিয়নের কথা
৪ ও ৫। সাহিত্য আর নাটক সম্বন্ধে গবেষণা ও আলোচনা।

এগুলি বেশীর ভাগই 'ভোরবা' (সৃজনী সাহিত্য), 'রুদে প্রাভো' (সাম্যবাদীর অধিকার)তে আছে, অন্যগুলো পাওয়া যাবে কাসেন, প্রামেন, প্রোলেকাল্ট, দোবা, দি সোশালিস্ট, আভান্তগার্ড এবং আর আর সাহিত্য এবং রাজনীতিমূলক পত্রিকায়।

জুলিয়াস জেয়ার সম্বন্ধে যে গবেষণা করেছিলাম, তার পান্ডুলিপি জিরগালের কাছে আছে। প্রকাশক হিসেবে ওর সাহসের জন্য ওকে আমি ভালবাসি। জার্মান অধিকারের সময় ও আমার 'বোজেনা নেমকেভা' বার করেছিল। সাবিন আর জান নেরুদা সম্বন্ধে কিছু লেখা জেলিনেকদের বাড়ীতে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, ওদের প্রায় সবাই-ই তো মারা গেছে।

আমাদের এই যুগ নিয়ে একটা উপন্যাস শুরু করেছিলাম। আমার বাবা-মার কাছে তার দুটি পরিচ্ছদ আছে, আরগুলো বোধহয় নষ্ট হয়ে গেছে। গেস্টাপো ফাইলে আমার কয়েকটা গল্পের পাণ্ডুলিপি দেখলাম কাগজ পত্রের ভিতরে।

আগামী দিনের কোনও সাহিত্যের ঐতিহাসিকের হাতে দিয়ে গেলাম জান নেরুদাকে যে ভালবাসে সেই উত্তরাধিকার। তিনি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিঃ তাঁর দৃষ্টি আমাদের থেকে বহুদূরে ভবিষ্যতে প্রসারিত। তাঁর সম্বন্ধে এমন কোন আলোচনা হয়নি যাতে তাঁকে উপলব্ধি করা যায়, তাঁর মূল্য নির্ধারণ হয়। সর্বহারার কবি হিসাবে তাঁর ছবি এখনও আঁকা হয়নি। তিনি জন্মেছিলেন শ্রমিক এলাকা স্মিচভের এক প্রান্তে, তার 'কবরের ফুলের' মাল মসলা জোগাড় করেছিলেন রিংহফার মিলের আশপাশ থেকে। কবরের ফুল থেকে '১৮৯০ সালের পয়লা মে', কবি নেরুদাকে সেই পটভূমিকা ছাড়া বোঝা শক্ত। তাই বেশীর ভাগ—এমন কি শালদার মতো বিচক্ষণ সমালোচক পর্যন্ত মনে করেন যে তাঁর সাংবাদিকতা কবিতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজে কথা। নেরুদা সাংবাদিক বলেই তাঁর পক্ষে গাথা, সনেট, 'শুক্রবারের স্তোত্র' আর 'সহজ সুরের' মতো বিখ্যাত রচনা সম্ভব হয়েছে। সাংবাদিকতা ক্লান্তিকর, লক্ষ্যচ্যুত সে করে বটে, কিন্তু পাঠকের সঙ্গে সে স্থাপন করে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, এমন কি কবিতা সৃষ্টি করতেও সে শেখায়—হাঁ, তবে নেরুদার মতো সাংবাদিক তাকে হতে হবে। সংবাদপত্রে না লিখে জান নেরুদা মোটা মোটা কবিতার বই লিখতে পারতেন, কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী সে রচনা তো এমনি করে বাঁচত না। কিন্তু তাঁর কবিতা বেঁচে আছে, থাকবে। এখনও যে কেউ 'সাবিনা' শেষ করতে পারে। হাঁ, শ্রম তাঁর সার্থক হবে বইকি।

বাবা-মা আমাকে ভালোবাসেন, তাঁদের সহজ-সরল জীবন। তাঁদের জীবনে হেমন্তকে আমি রৌদ্রকরোজ্জ্বল করে যেতে চাই। এই সংকল্প আমার অধিকাংশ রচনাকে সার্থক করে তুলবে। আমি চলে গেলে তাঁদের জীবনে যেন মেঘ ঘনিয়ে না আসে তাই-ই আমি চাই। শ্রমিক মরণশীল, কিন্তু তার শ্রমের ফল তো রইল বেঁচে, আমি থাকব তাদেরই সাথী হয়ে, তাদের পরিমণ্ডলের আলো আর উষ্ণতার মাঝে আমি বাঁচব।

আমার বোন লিবা আর ভেরার কাছে অনুরোধ, আমাদের পরিবারে আজ যে শূন্যতা এল যেন হাসিগানে তাকে ভরিয়ে দেয়, বাবা-মাকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। ওরা যখন পেটচেক বিল্ডিং-এ দেখা করতে এল, চোখে জল ঝরছিল। কিন্তু আনন্দও ছিল সেখানে, তাইতো আমরা পরস্পরকে এত

ভালবাসি। তারা আনন্দ বিলিয়ে চলেছে চারদিকে—তাদের সুখ যেন কোন কিছুতেই না নিঃশেষ হয়ে যায়।

এই শেষ সংগ্রামে যারা আজ রত, তাদের প্রতিজনের করমর্দন করছি, যারা আমাদের পরে আসবে তাদের কাছেও বাড়িয়ে দিলাম হাত। গাস্তিনা আর আমার হাত তারা মুঠোয় চেপে ধরবে; আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি।

আবার বলি, আমরা সুখ আর শান্তির জন্য বেঁচে আছি, তারই জন্য লড়াই করতে চাইছি, আর তারই জন্য প্রাণ দিচ্ছি। আমাদের নামের সঙ্গে যেন দুঃখ না জড়িয়ে থাকে।

জে. এফ.

মে ১৯শে, ১৯৪৩

বাইশে মে, ১৯৪৩

সই আর সীল মোহর হয়ে গেছে। যে বিচারকের উপরে মামলার ভার ছিল তিনি কাল আমার সম্বন্ধে রায় দিয়েছেন। ভাবতেও পারিনি, এত তাড়াতাড়ি শেষ হবে। মনে হয়, ওদের বিশেষ তাড়া ছিল। আমার সঙ্গে অভিযুক্ত হয়েছিল লিডা প্লাচা আর মিরেক। দলত্যাগে তার বিশেষ সুবিধে হয়নি।

হাকিমের সুমুখে সব কিছু কেমন নিরুত্তেজক ত্রুটিহীন রূপ নিয়ে দেখা দিল। কেমন ঠাণ্ডা যেন, আমরা তো শিউরেই উঠলাম। কিন্তু গেস্টাপোর প্রধান ঘাঁটিতে সব কিছু জীবন্ত, ভীতিপ্রদ হলেও সে যেন জীবনেরই এক অংশ। সেখানে আছে উন্মাদনা—একদিকে সংগ্রামীর উন্মাদনা আর এক দিকে শিকারীর, হিংস্র পশুর বা সাধারণ দস্যুরও বলতে পার। ও পক্ষেরও কারও কারও একটা মতবাদ আছে। কিন্তু হাকিমের সামনে তো বিচারালয়ের আইন কানুন ছাড়া আর কিছু নেই। প্রকাণ্ড লোকটা, কোটে বাঁকানো ক্রশ আঁটা, যে বিশ্বাসের সে পরিচয় দিচ্ছে তা তো তার ভিতরে নেই। সে এক ঢাল—তারই আড়ালে খুদে আমলা লুকিয়ে আছে। দেখলে করুণা হয়। কোনও রকমে এই যুগে সে টিকে থাকতে চাইছে। অভিযুক্তদের কাছে তার ভালো বা মন্দ কোনো বিশেষণ নেই। সে হাসে না, মুখ বিকৃতি তার নেই। শুধু সরকারী কর্তব্য সে করে চলেছে। রক্তের বদলে ওর শিরায় উপশিরায় বইছে ক্ষীণ জলের ধারা।

ওরা প্রমাণগুলো নকল করেছে, আইনের সূত্রগুলো আওড়াচ্ছে, তারপর সই মারছে। বিশ্বাসঘাতকতা আর রাইখের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, সশস্ত্র

অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি—এমনি ছ'টি অভিযোগ—সব জানিও না। একটাই তো যথেষ্ট।

তেরো মাস ধরে আমি আমার এবং আর সবারও বাঁচবার জন্য লড়েছি—কখনও বা রুখে দাঁড়িয়েছি, কখনও বা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছি। ওদের পার্টির বক্তৃতামঞ্চ থেকে নর্ডিক কৌশলের কথা শোনা যায়, কিন্তু আমার তো মনে হয় ওদের উপর সেদিক থেকে টেক্কা দিয়েছি আমি। আজ যে আমি হেরেছি, তার সোজা কারণ, কৌশল ছাড়াও ওদের হাতে রয়েছে ক্ষমতার কুড়ুল।

সে-দ্বন্দ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে এসেছে। এখন শুধু প্রতীক্ষা। অভিযোগের ফল ফলতে দু-তিন সপ্তাহ বাকী। তারপর রাইখ যাত্রা, বিচারের প্রতীক্ষা, দণ্ডাদেশ, অবশেষে এ ফাঁসির জন্য একশত দিনের প্রতীক্ষা। এই তো আমার চার পাঁচ মাসের ভবিষ্যত। এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটতে পারে। সব কিছু বদলেও যেতে পারে। বোধ হয় তা সম্ভব। এখানে বসে কিছু ভাবতেও পারছি না। বাইরের ঘটনা প্রবাহের পরিবর্তন আবার আমাদের সমাপ্তির দিন এগিয়ে আনতেও পারে। তাতেও আমাদের কোনও সাহায্যই হবে না।

যুদ্ধ আর আশার সঙ্গে এ এক দৌড় চলেছে বটে। একরকম মৃত্যুর সঙ্গে আর এক রকমের মৃত্যুর প্রতিযোগিতা। কে আগে যাবে—ফাশিজমের মৃত্যু—না, আমার? একি শুধু আমারই ব্যক্তিগত প্রশ্ন? না, না, হাজার হাজার বন্দী, লাখো লাখো সৈনিক এই একই প্রশ্ন করছে। সারা ইওরোপের লাখো লাখো জনগণের মুখে, সারা পৃথিবীর মুখে এই একই জিজ্ঞাসা। কারও বা বেশী আশা, কারও বা কম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে এ তো মরীচিকা। ধনতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতা আজ পৃথিবীকে বিভীষিকায় আচ্ছন্ন করে তুলেছে। হাজার হাজার মানুষ মরবে—আর কি চমৎকারই না তারা—তারপর যারা বেঁচে থাকবে তারা বলবেঃ ফাশিজমের অধ্যায় আমি পার হয়ে এলাম।

এ তো কমাসের ব্যাপার, শীঘ্রই কদিনের ব্যাপারে দাঁড়াবো কিন্তু নিষ্ঠুরতম হয়েই আসবে সে দিনগুলি। কতবার ভেবেছি, যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে শেষ সৈনিক যে হবে, শেষ বুলেটটি এসে যখন বুকে বিঁধবে সে হবে কত মর্মান্তিক। কিন্তু শেষ সৈনিক তো একজন হবেই, সর্বশেষ সে-ই পড়বে লুটিয়ে। যদি জানতাম আমিই শেষ সৈনিক হতে পারব, তা হলে এই মুহূর্তে চলে যেতাম।

প্যানক্রাটস্‌-এ আর বেশী দিন নেই, তাই যে ভাবে এ নামটাকে রূপ দিতে চেয়েছি, তা হোল না। এখন সংক্ষিপ্ত করতে হবে। চরিত্রগুলোর দিকে

নজর দিতে হবে বেশী, ইতিহাসের এই অধ্যায়ের দিকে নয়। মানুষগুলিই বেশী প্রয়োজনীয়।

আমি জেলিনেক দম্পতির বর্ণনা শুরু করেছিলাম। সাধারণ মানুষ, স্বাভাবিক সময়ে এদের ভিতরে বীর খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রেফতারের সময়, তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল, হাত মাথার উপর তোলা—জেলিনেক ম্লান, আর শ্রীমতীর মুখে যক্ষার রক্তাভ আভাস। তার আদর্শ গৃহস্থালি যখন গেস্টাপোরা পাঁচ মিনিটের ভিতরে তছনছ করে ফেললো, চোখে ভয়ের ছায়াই দেখা দিয়েছিল। তারপর সে আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলঃ

—জো, এখন কি হবে?

কখনও জেলিনেক বেশী কথা বলে নি, কথার জন্য চিরদিনই তাকে হাতড়ে বেড়াতে হোত, কথা তাকে উত্তেজিত করে তুলত। কিন্তু আজ সে শান্ত স্বরেই উত্তর দিল। তাকে চেষ্টা করতে হোল না। স্বরে ছিল না বিষাদঃ

মারি, এবার আমরা মরতে যাচ্ছি।

শ্রীমতী চেঁচিয়ে উঠল না, একটু কাঁপলও না। লীলায়িত ভঙ্গীতে সে তার ডান হাত নামিয়ে তার স্বামীর হাত চেপে ধরল। পিস্তলের উদ্যত নলের মুখে দাঁড়িয়ে তারা। তারই পুরস্কার পেল মুখের উপর প্রথম আঘাত। শ্রীমতী তার গাল মুছে হানাদারদের আপাদমস্তক দেখে নিল, তার পর অদ্ভুত ভঙ্গীতে বলে উঠলঃ

আহা, এমনি সুন্দর ছেলেরা। সে চেঁচিয়ে উঠল, এমন সুন্দর অথচ এত পশু।

নির্ভুল তার পরিমাপ। কয়েক ঘণ্টা পরেই তারা তাকে 'তদন্তকারী কমিসারের' আফিস থেকে অচেতন অবস্থায় বার করে নিয়ে এল। কিন্তু কোন কথা বার করতে পারল না। তখন বা তার পরেও সে কিছু বলে নি।

শুনানির অনুপযুক্ত হয়ে সেলে শুয়ে আছি, তাদের কি ঘটেছে জানি না, তবে এইটুকু জানি, তারা কিছু বলে নি। তারা আমার নির্দেশের অপেক্ষা করছিল। জেলিনেককে কতদিন হাত পা বেঁধে ওরা অবিশ্রাম মেরেছে, কিন্তু আমাকে সেখানে না আনা পর্যন্ত একটি কথা সে বলেনি। আমি মাঝে মাঝে চোখের সংকেতে জানিয়েছি আমাদের এই জেরার জের কাটিয়ে ওঠবার জন্য কতটুকু বলতে হবে।

তার স্ত্রী কোমল, স্পর্শকাতর। তাকে গ্রেফ্তারের আগে তো তাই জানতাম। কিন্তু গেস্টাপো ঘাঁটিতে তার চোখে কখনও জল দেখিনি। তার ছোট্ট বাসাটি, গৃহস্থালী ছিল তার গর্ব। কিন্তু যখন বাইরের কমরেডরা

খবর পাঠাত কে তার আসবাবপত্র চুরি করেছে তারা জানে, তাকে সর্বদা নজরে রাখছে, সে উত্তর দিত:

—চুলোয় যাক আসবাবপত্র! ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট কোরো না। অনেক বড় কাজ করবার আছে। আমরা নেই—এখন তো সবাইকে দুনো কাজ করতে হচ্ছে। আগে জায়গাটা ঘষে মেজে সাফ করি, তারপর যদি বেঁচে থাকি তখন আমার বাড়িঘরের ব্যবস্থা আমি নিজে করব।

একদিন ওরা জেলিনেকদের নিয়ে গেল। দুজনকে দু-জায়গায় পাঠাবে। তাদের ভাগ্যে কি হোল, জানতে বৃথা চেষ্টা করেছি, কিন্তু গেস্টাপো নির্যাতনের পর কত মানুষ এমনি হারিয়ে গেছে—হাজার হাজার কবরে ছড়িয়ে পড়েছে। এই যে ভয়াবহ বীজ উপ্ত হোল, কেমন ফসল একদিন ফলবে বল!

তার শেষ বাণী:

—কর্তা, বাইরের ওদের বলবেন, ওরা যেন আমার জন্য দুঃখ না করে, আমার অদৃষ্ট দেখে ওরা যেন ঘাবড়ে না যায়। আমার কর্তব্য করেছি, এবার মরবও মজুরের মতোই।

সে ছিল 'ঝি'। কখনও বেশী লেখাপড়া শেখেনি। বহু শতাব্দী আগেকার সেই বীরত্বব্যঞ্জক সে-বাণী সে জানত না:

যাত্রী, ল্যাকেডেমোনিয়ানদের বোলো, কর্তব্যের দাবি মেটাতে আমরা এখানে মৃত্যু বরণ করলাম।

ভিসুশীলরা

একই বাড়িতে জেলিনেকদের ঠিক পাশেই থাকত। ওদের নামও জোসেফ আর মারি। নিচুদরের সরকারী কর্মচারীর পরিবার, প্রতিবেশীদের সবার চাইতে বয়সে কিছু বড়। প্রথম মহাযুদ্ধে যখন সৈন্য হিসেবে চলান দেওয়া হয়েছিল তখন ওর বয়েস ছিল সতের বছর। নাস্‌ল্-এর এক তরুণ ছিল সে। কয়েক সপ্তাহ পরেই ওরা ওকে নিয়ে এল, হাঁটু ভেঙে গেছে, সে হাঁটু আর সম্পূর্ণ আরোগ্য হোল না। ওদের প্রথম দেখা হয় ব্‌রনো-র হাসপাতালে, শ্রীমতী সেখানে ছিল নার্স। ওর থেকে আট বছরের বড়, এক অশান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন সে তখন ত্যাগ করে এসেছে—এই লম্বা রেলের কেরানী আর মেয়েটি জড়িয়ে পড়ল এমনি এক বন্ধনে—যাকে এমনি নিষিদ্ধই বলা চলে।

আমার কিছুদিন পরেই স্বামী ধরা পড়ল, তাকে প্রথম দেখে ভয় পেয়েছিলাম। ও যদি ফাঁস করে দেয়, কতখানি ক্ষতি হবে আমাদের। কিন্তু সে বলে নি। সে একজন বন্ধুকে কয়েকখানা রাজনীতিক ইশ্‌তেহার পড়তে

দিয়েছিল—তার জন্য তাকে আনা হয়েছিল। ইশ্তেফানের থেকে বেশীদূর সে এগোয়নি।

কিছুদিন আগে পোকোর্নি আর পিক্সোভার অপরিণামদর্শিতায় এই কথা বেরিয়ে পড়ে যে হোনজা চার্নি শ্রীমতী ভিসুশীলোভার বোনের সঙ্গে থাকতেন। তাই তারা জো-কে জেরা করতে ধরে নিয়ে এল, আমার গ্রেফ্তারের দুদিন পরে, তার কাছ থেকে আমাদের কেন্দ্রীয় পরিষদের শেষ স্তম্ভের সম্বন্ধে কিছু বার করতে ওরা চেষ্টা করল।

তৃতীয় দিনে সে এল চারশো নম্বরে, সাবধানে বসলঃ ক্ষত নিয়ে বসতে গেলে ভীষণ ব্যথা লাগে। আমি ওর দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকালাম, উৎসাহও ছিল সে দৃষ্টিতে। ও ঠিক নাস্‌ল্‌ অঞ্চলের লোকের ভঙ্গীতেই বললঃ

যখন অস্বীকার করেছি, তখন আমার পিছন দিকটা যতই ক্ষতবিক্ষত করুক, আমার কাছ থেকে কিছুই বার করতে পারবে না।

আমি এই দম্পতিকে জানতাম—ওরা পরস্পরকে কি ভালই না বাসত, দু-একদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হলে দুজনেই কি নিঃসঙ্গ বোধ করত। এখন তো মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে। তাদের সেই সুন্দর গৃহে স্ত্রী এখন একা কি দুঃখে দিন কাটাচ্ছে বুঝতে পারছি। এই বয়সে নিঃসঙ্গতা তো মৃত্যুর চাইতে কষ্টকর। এরই মধ্যে তার স্বামীকে ফিরিয়ে আনবার জন্য সে কত না ফন্দী এঁটেছে। তাকে সে তাদের জীবনের এই ক্ষুদ্র গাথায় ফিরিয়ে আনতে চায়, তারা পরস্পরকে এখানে খুদে মা আর খুদে বাবা বলে ডাকে। কিন্তু এখন তো পথ একটাই সে পেয়েছে—গোপন আন্দোলনের কাজের পথ, দু-জনের কাজ সে একাই করছে।

১৯৪৩ সালের নতুন বছরের আগের দিন একাই সে টেবিলে বসেছিল। স্বামী যেখানে বসত, সেখানে ছিল তার ছবি। দুপুর রাত হতেই, সে শূন্য আসনের সামনের গেলাসে ঠোকাঠুকি করে স্বাস্থ্য পান করল তার স্বামীর উদ্দেশ্যে, কামনা করল তার প্রত্যাবর্তন... স্বামী যেন স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত বেঁচে থাকে এই ছিল তার সবচাইতে বড় কামনা।

একমাস পরে সেও গ্রেফতার হোল। চারশো নম্বরে আমরা অনেকেই শিউরে উঠলাম। ওর মধ্যস্থতায় আমরা বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম।

একটা কথাও সে বলেনি।

ওরা তাকে মারল না। সে তখন এত অসুস্থ—কয়েক ঘা খেলেই মরে যেত। কিন্তু তার চাইতে বেশী অত্যাচার হোল কল্পনার সাহায্যে।

ওর গ্রেফতারের ক'দিন আগে তার স্বামীকে 'বেগার খাটাবার' জন্য পোল্যান্ড চালান দেয়া হয়েছিল। এবার তারা বললঃ

দেখ, সুস্থ মানুষের পক্ষেই সে বড় দুঃখের জীবন। তোমার স্বামীতো পঙ্গু, এ ধকল তার সইবে না। ঠিক ও মরে যাবে, তুমিও আর ওকে দেখতে পাবে না। তারপর এবয়সে কোথায় যাবে স্বামী খুঁজতে? অবুঝ হয়ো না, কি জান বল, ওকে আমরা এখুনি তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব।

—আমার জো, বেচারী জো, ওখানেই কোথাও মরে যাবে। কে জানে কি রকম সে মৃত্যু? আমার বোনকে ওরা খুন করেছে, স্বামীকে খুন করবে, আমি থাকব একা। মরণ পর্যন্ত একা। এ বয়সে আর কাকে পাব? কিন্তু ওকে আমি বাঁচাতে পারি। ওরা দাম পেলে ওকে ফিরিয়ে দেবে। না, না, দাম দিলে আমি তো আর আমি থাকব না, আর ওভাবে ফিরে পেলে যাকে পাব, সে আমার স্বামী নয়।

সে একটি কথাও বলল না।

গেস্টাপোর চালানের নামহীন ভিড়ে সেও একদিন মিলিয়ে গেল। তার পরেই খবর এল, জো পোল্যান্ডে মারা গেছে।

লিডা

বাকসাসদের ওখানে প্রথম যেদিন গেলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। জোসে একা বাড়ীতে, আর একটি ছোট্ট মেয়েকেও দেখলাম, চোখে তার সজীবতা, ওরা ওকে লিডা বলে ডাকত। একেবারে ছেলেমানুষ, দাড়ির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল মেয়েটি, বোধ হয় ভাবছিল ওকে খানিকটা আনন্দ দেবার জন্য একটি জীবের উদয় হয়েছে।

তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এখন জানলাম এই শিশুটির বয়েস প্রায় উনিশ বছর, একটু অবাক হলাম। জোসের সৎ বোন। ওর কৌলিক উপাধি প্লাচা (ভীরু), কিন্তু ওর ভিতরে সে বিশেষত্ব নেই। সৌখীন অভিনয়ে খুব সখ।

তার বিশ্বাসভাজন হলাম। সব কিছু সত্ত্বেও আমার প্রৌঢ়ত্বটা সম্বন্ধে আমাকে সে সজাগ করে তুলল। তার যৌবন-সুলভ দুঃখ আর স্বপ্নের কথা সে আমার কাছে বলত, বোন বা ভগ্নিপতি কারও সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে তর্ক বাধলেই সে আমার কাছে মীমাংসার জন্য ছুটে আসত। তরুণীরা যেমনি কোপনা হয়, সে ছিল তেমনি, আর বেশী বয়েসের সন্তানের মতো আদুরেও বটে।

ছ'মাস ধরে একটা বাড়িতে থাকবার পর প্রথম যেদিন বেরুলাম, সে ছিল আমার সঙ্গী। বয়স্ক লোক খুঁড়িয়ে চলেছে, সঙ্গে তার মেয়ে, একা ঘোরার চাইতে এ ঢের ভালো—সহজে নজর পড়ে না। যাদের পাশ কাটিয়ে গেলাম,

সবাই ওর দিকে তাকাল, আমার দিকে নয়। তাই আমার ভ্রমণের সময় ও হোল আমার সঙ্গী, যখন প্রথম গুপ্তসভায় গেলাম ও ছিল আমার সঙ্গে। তাই আমার প্রথম গোপন আশ্রয়ে সে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। তাই—অভিযোগে ওরা একথা বলেছে—এমনি করে ও আমার গুপ্ত-সংবাদবাহিকা হয়ে উঠল।

সেও খুশি মনেই কাজ করেছে, কাজ বা তার তাৎপর্য নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ব্যাপারটা নতুন তাছাড়া একটা আকর্ষণও আছে। সবাই একাজ করে না—আর আছে দুঃসাহসিকতার আমেজ। আর কি চাই! হ্যাঁ—আর কিছু সে চায়নি।

যখন সে ছোট খাটো কাজগুলো করত, ওকে বিশেষ কিছু বলিনি। যত কম জানে ততোই ভালো, ধরা পড়লে নিজেকে ভাল করে সমর্থন করতে পারবে—আর যদি অনেক জানে তাহলে হয় তো তা সম্ভব হবে না—নিজেকে দোষী মনে হবে।

লিডা তাড়াতাড়ি শিখে নিল, জেলিনেকদের ওখানে ছোটোখাটো খবর নিয়ে ছুটোছুটি করার চাইতে তখন সে ঢের বেশি দায়িত্ব নিতে সক্ষম। এবার সময় এল, সব কিছু বুঝিয়ে বললাম। আমি ওকে শেখাতে শুরু করলাম। রীতিমত স্কুল, লিডা খুশি মনে শিখল, উগ্র তখন তার শেখার ইচ্ছা। বাইরে সে রইল তেমনি হাসিখুশি চঞ্চল মেয়ে, কিন্তু ভিতরে এল পরিবর্তন। সে তখন পূর্ণতা পাচ্ছে, গভীরভাবে ভাবতে শিখেছে।

এই কাজের সম্পর্কে মিরেকের সঙ্গে তার পরিচয়। মিরেক তখন বহু কাজ করেছে আর সে সম্বন্ধে জোর করে জাহির করারও তার ক্ষমতা ছিল। সে ওর মনের উপর গভীর ছাপ ফেললো। ওর চরিত্রের মূলগত লক্ষণগুলো সম্বন্ধে ও হয়তো বিচার করে দেখেনি, আমি নিজেও তো সেদিক থেকে ভুল করেছিলাম। তার কাজ, তার বিশ্বাস অন্যান্য তরুণদের চাইতে লিডাকে তার কাছে টেনে নিয়ে গেল।

ভালোবাসার জন্ম হোল, সে দিল গভীরে তার শিকড় চালিয়ে।

১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে সে পার্টির সভ্য হওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে শুরু করল। খানিকটা দ্বিধা ছিল তার প্রশ্নে। আগে কখনও এমনি দ্বিধা দেখিনিঃ কখনও কোন কিছুরই সে গুরুত্ব দেয়নি। আমি বিষয়টা নিয়ে ভাবলাম, ওর শিক্ষা চলতে লাগল। তখনও যাচাই করে দেখা আমার ইচ্ছে।

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় পরিষদ থেকে সরাসরি ভোটে ওকে পার্টিতে নেওয়া হোল। আমরা সে রাতে প্রচণ্ড তুষারপাতের ভিতর দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। ও একেবারে চুপচাপ, অথচ বেশী কথাই তো

বলত। বাড়ির কাছে একটা মাঠ পেরুচ্ছি, হঠাৎ সে থেমে গেল। চারদিক নিস্তব্ধ; তুষারপাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এবার সে আস্তে আস্তে বলল:

জানি এ আমার জীবনের এক পরম দিন। আর আমি তো আমার নিজের নই। তোমাদের কাছে শপথ করেছি, যা-ই ঘটুক না কেন, আমি তোমাদের হতাশ করব না।

তারপর বহু ব্যাপার ঘটে গেছে, কিন্তু হতাশ সে করে নি। উপরের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ সে-ই রাখত। যে সব উপদল পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক করবার ঝুঁকি তাকেই নিতে হয়েছিল। কোনও কর্মীকে আসন্ন বিপদের আগে সে-ই দিত সাবধান করে। যখন আমাদের নেতাদের বা গুপ্ত আস্তানার বিপদ ঘনিয়ে আসত, সে কুঁচ মাছের মতো অলক্ষ্যে মিলিয়ে যেত, তারপর সব ব্যবস্থা করেই ফিরত। তেমনি চঞ্চল সে, চঞ্চলভাবেই ছোট বড় সব কাজগুলো করত। কিন্তু চঞ্চলতার নিচে এবার দেখা দিল দৃঢ় দায়িত্ববোধ।

আমাদের একমাস পরে সে গ্রেফ্‌তার হোল। মিরেক তার স্বীকারোক্তির সময় তার নাম বলল। ওরা অনুসন্ধান করে জানতে পারল সে তার বোন আর ভগ্নীপতিকে পালাতে সাহায্য করেছে। সে তেমনি মাথা নেড়ে চপল ভাবপ্রবণা মেয়ের ভূমিকায়ই অভিনয় করে যাচ্ছিল। সে যে বে-আইনী কিছু করছে যেন জানে না এমনি তার ভাবখানা। তার সাংঘাতিক পরিণতি সম্বন্ধে সে যেন অজ্ঞ।

সে আমাদের অনেক কিছুই জানত, কিন্তু কিছুই বলেনি। আর সব চাইতে যেটা দরকার তাই সে করেছে। কাজ করে গেছে। তার পরিবেশ আর পদ্ধতি দুই-ই বদলে গেছল, কাজের ধারাও তখন নতুন, কিন্তু সে কখনও হাত গুটিয়ে বসে থাকে নি। পার্টির প্রতি কর্তব্য তো বদলে যায় নি। তাকে যা করতে দেওয়া হোত সে তাড়াতাড়িই করত। কোথাও ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল না। কোন একটা জটিল ব্যাপারের জট ছাড়াতে হবে, কাউকে বাঁচাতে হবে, লিডা হাসিমুখে সে দায়িত্ব তুলে নিত নিজের উপর। সে প্যানক্রাটস্‌-এর মেয়েদের বিভাগের তত্ত্বাবধানকারিণী ছিল। বাইরের কত অজানা লোককে সে যে খবর পাঠিয়ে গ্রেফ্‌তারের হাত থেকে বাঁচিয়েছে তার ঠিক নেই। এক বছর ধরেই এমনি চলছিল। একদিন তার সেই সংবাদ পাঠানো ধরা পড়ল, তারপর থেকে এই ভূমিকা তার সাঙ্গ হোল।

এখন সে আমাদের সঙ্গেই চলেছে তৃতীয় রাইখে, সেখানে বিচার হবে। আমাদের এই দলের মধ্যে তারই শুধু স্বাধীনতা লাভের দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকার ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে। সে তরুণী। আমরা যদি না থাকি, তাকে তোমরা হারিও না। অনেক কিছু তাকে এখনও শিখতে হবে। তাকে

শিখিও, তার মনকে পঙ্গু হতে দিও না, কিন্তু তা যেন গর্বিত না হয়ে ওঠে, অথবা যা করেছে তাতেই যেন সন্তুষ্ট না হয়। সংগ্রামের ভীষণ অগ্নি পরীক্ষায় সে টিকে গেছে। আগুনের ভিতর দিয়ে সে পার হয়ে গেছে, খাঁটি ধাতুতে গড়া তারই প্রমাণ সে দিয়েছে।

আমার কমিসার

এই চরিত্র-চিত্রের পর্যায়ে সে পড়ে না, কিন্তু একটা লোক বটে—কৌতুহল জাগিয়ে তোলে—আর সবার থেকে আলাদা—তার উপর দৃষ্টি পড়বেই।

দশ বছর আগে ভিনোরাদির ফ্লোরা কাফেয় বসে যখনই টাকা টেবিলে ঠুকে বা চেঁচিয়ে প্রধান পরিচারককে হাঁক পেড়ে বলতে যেতে, বিল চাই, তখনই হঠাৎ ঢ্যাঙা আর রোগা একটি লোক এসে উদয় হোত তোমার পাশে, তার পরণে কালো লেজঝোলা কোট। চেয়ারগুলির ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে সে সরীসৃপের মতোই চলে যেত, যেন সাঁতরে চলেছে, কিছুক্ষণ পরেই তোমার বিল এনে হাজির করত তোমার সম্মুখে। শিকারী পশুর মতোই নিঃশব্দ দ্রুত ভঙ্গী, সব কিছু এক লহমায় দেখে নিত। তোমার খাবারের ফরমায়েস দেবারও দরকার হোত না। সে পরিচারককে বলতে পারতঃ তিন নম্বর টেবিলে সাদা কাফি আর সর, বাঁদিকের জানালার পাশের টেবিলে পেস্ট্রী 'আর পিপলস্ পেপার।' খদ্দেরদের ভারী পেয়ারের লোক ছিল সে, সাঙাৎদেরও তাই।

তখন আমি ওকে চিনতাম না। জেলিনেকদের ওখানে বহু পরে ওর সঙ্গে পরিচিত হলাম। পেন্সিলের বদলে একটা পিস্তল নিয়ে আমার দিকে লক্ষ্য করে ও বলেছিলঃ 'এইটে'র উপরই আমার সবচাইতে লোভ বেশী।

সত্যি বলতে কি তারপর থেকে পরস্পরের দিকে আমরা আকৃষ্ট হলাম।

সহজাত বুদ্ধি আর লোক চেনবার ক্ষমতা ওর অসাধারণ। এই জন্য পুলিসের অপরাধ-বিভাগে কাজ নিলে ওর উন্নতি হোত অসাধারণ। খুদে পাপী আর খুনে সমাজ-তাড়ানো বিচ্ছিন্ন লক্ষ্মীছাড়ার দল ওর কাছে মনের কথা খুলে বলতে দ্বিধা করত না। কারণ, নিজেদের বাঁচানোই ওদের একমাত্র চিন্তা। কিন্তু পুলিসের রাজনীতিক বিভাগের হাতে কমই এই গা-বাঁচানোর দল পড়ে। এখানে পুলিসীবুদ্ধির সঙ্গে, যাকে ধরে আনলো শুধু তার বুদ্ধিরই লড়াই চলে না, লড়াই চলে এক বৃহত্তর শক্তির সঙ্গে। এক মতবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়, লড়তে হয় এক দলের সমষ্টিগত বুদ্ধির বিরুদ্ধে। ছল, চাতুরী আর আঘাত কখনও মতবাদকে চূর্ণ করতে পারে না।

'আমার কমিসারের' ভিতরে তুমি অন্তরের কোনও বিশ্বাস খুঁজে পাবে না। যদি আর কারও ভিতর সে-বিশ্বাস থেকে থাকে তাও নির্বুদ্ধিতার মিশেল দেওয়া, তাতে কৌশল নেই, নেই বুদ্ধি আর আদর্শ। মোটের উপর তারা যদি সফল হয়ে থাকে তো সংগ্রাম বহুদিন ধরে চলেছে আর সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ আছে বলেই তা সম্ভব হয়েছে। হয়তো আগেকার গোপন সংগ্রামের চাইতে এখানে জটিলতর পরিস্থিতি বলেই তা সম্ভব হয়েছে। রুশ বলশেভিকরা বলতেন, গোপন আন্দোলনের সত্যিকারের কর্মীর আয়ু মাত্র দু'বছর। মস্কো যদি তার পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে, পেট্রোগ্রাদে সে চলে যেতে পারে; সেখান থেকে ওডেশায় গিয়ে লাখো লাখো নগরবাসীর ভিতরে মিলিয়ে যেতে পারে। সেখানে কেউ তাদের চিনবে না। কিন্তু এখানে আমাদের আছে শুধু প্রাহা, প্রাহা, প্রাহা। এখানে অর্ধেক লোক তোমাকে চেনে, শত্রুর গুপ্তচর এখানে গিস্‌গিস্ করছে। তবুও আমরা বছরের পর বছর ধরে টিকে আছি। এমন অনেক কমরেড আছেন, যারা পাঁচ বছর গোপনে কাজ করছেন, গেস্টাপোরা এখনও তাদের আবিষ্কার করতে পারে নি। তার কারণ, আমরা অনেক কিছু জানি। হাঁ, আর শত্রুরা নিষ্ঠুর ও শক্তিমান হলেও ধ্বংস ছাড়া আর কিছু জানে না।

১১—ক বিভাগে তিন জন লোক কমিউনিজম উৎখাতের প্রধান পান্ডা বলে নাম কিনেছে, আন্তঃশত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য তারা পেয়েছে সাহসের খেতাব কালো-সাদা-লাল ফিতে। তারা ফ্রিডরিখ, জান্দার আর আমার কমিসার, জোসেফ বম। তারা হিটলারী ন্যাশন্যাল সোশালিজম সম্বন্ধে খুব কমই জানে। কোনও রাজনীতিক আদর্শ নিয়ে তারা যুদ্ধে নামেনি, নেমেছে নিজেদের স্বার্থে। নিজের নিজের ধরনে চালাচ্ছে যুদ্ধ। জান্দার—বেঁটে-খাঁটো সাধারণ মানুষটি, অতিমাত্রায় বিদ্বেষী—পুলিসী বিভাগের ধরনধারন সবার চাইতে বেশীই জানে, তার চাইতে বেশী জানে টাকা রোজগারের ফন্দি-ফিকির। প্রাহা থেকে কিছু দিনের জন্য বার্লিনে বদলি হয়েছিল, আবার তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে এসেছে। রাইখের রাজধানীতে চাকরি তার সয়নি; এ যেন অবনতি—টাকার দিক থেকেও বটে। অন্ধকার আফ্রিকায় বা প্রাহার ঔপনিবেশিক দপ্তরের উপরওলা হওয়া বার্লিনের কাজের চাইতে ঢের ভালো। প্রভুত্ব করা তো চলেই তার উপরে ব্যাংকের খাতায় অংক বাড়ে। জান্দার খুব খাটিয়ে লোক, এমন কি ডিনারে বসেও সে জেরা বা তদন্ত করে—সে যে কত খাটে দেখাতে চায়। আফিসের কাজে এই নিষ্ঠা তাকে দেখাতেই হয়, যাতে করে লোকে তার অফিসের বাইরের স্বার্থের খোঁজ না রাখে। যারা তার হাতে পড়ে তাদের উপর আমাদের করুণা হয়, তার চাইতেও বেশী করুণা হয় তাদের উপর যাদের ব্যাংকের খাতা বা অন্য কোনও রকম

জামানত আছে। সে লোক তাড়াতাড়ি মরবেই। তার ব্যাংকের পাস-বই আর জামানতের উপর জান্দারের প্রচণ্ড লোভ। এ বিষয়ে ওর চাইতে পটু জার্মান অফিসার আর আছে কিনা সন্দেহ। এদিক থেকে ওর চেক সহকারী স্মোলারের সঙ্গে ওর তফাৎ খুবই কম। সে ভদ্র দস্যু—তোমার টাকা পেলে সে প্রাণে মারবে না।

ফ্রিডরিখ ঢ্যাঙা রোগা আর কেমন যেন রক্তহীন। কিন্তু তার চোখ দুটি শয়তানের, মুখেও তার শয়তানি হাসি। ১৯৩৭ সালে গেস্টাপো গোয়েন্দা হিসেবে এল সে চেকোস্লোভাকিয়ায়। যে সব জার্মান কমিউনিস্ট চেক রিপাব্লিকে এসে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের ধরে জার্মানীতে চালান দেওয়াই ছিল তার কাজ। মৃতদেহের প্রতি তার অদ্ভুত আকর্ষণ। কাউকে নির্দোষ বলে সে ভাবতে পারে না; তার আফিসের উঠোন যে একবার পেরিয়েছে সে-ই তার কাছে দোষী। স্ত্রীলোকদের সে শোনাতে ভালবাসে যে, তাদের স্বামীরা বন্দীশিবিরে মারা গেছে বা ফাঁসিকাঠে ঝুলছে। কাউকে জেরা করবার সময় তার ঐ দেরাজ থেকে সাত সাতটা ভস্মাধার বার করে দেখায়।

—নিজের হাতে এই সাতজনকে ঠেঙিয়ে মেরেছি, তোমাকে নিয়ে হবে আটজন।

এবার তার টানায় আটটি ভস্মাধার দেখা যাবে, জ্যান জিঝ্‌কাকে সে পিটিয়ে মেরেছে।

নানা মামলার কাগজপত্রের ফাইল ঘাঁটতে সে ভালোবাসে, তারপর একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেঃ

সব ঠিক আছে। মামলা শেষ!

মেয়েদের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার তার সবচাইতে ভালো লাগে।

পুলিসের কাজে তার বিলাসী মন অনেকখানি সাহায্যই করেছে। একখানা সাজানো-গোছানো ঘর বা একটা ফলাও ব্যবসা যদি তোমার থাকে, তার হাতে তোমার মৃত্যু হবে তাড়াতাড়ি।

তার চেক সহকারী নারজার, লম্বায় তার অর্ধেক—শুধু এইটুকুই তফাৎ।

আমার পেয়ারের কমিসার বম্‌-এর টাকা বা মৃতদেহের উপর লোভ নেই, তাই বলে এই দুজনের থেকে তার লাসের ফিরিস্তি যে খুব কম তা বলছি না। খাঁটি ভাগ্যান্বেষী তাকে বলা যায়, কেউকেটা হবার তার ইচ্ছে। গেস্টাপো বিভাগের পুরনো লোক। হিটলার আর বেরানের যখন গোপন পরামর্শ হোত,—নেপোলিয়ান-রুমে সে পাহারা দিত। হিটলারকে যেসব কথা বেরান নিজেও বলেনি সেইসব যোগ করত বম্‌। কিন্তু মানুষ শিকারের সুযোগের কাছে সে তো কিছুই নয়। তুমি তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হতে

পার, যে কোনো মুহূর্তে গোটা পরিবারটাই ধ্বংস করে ফেলতে হুকুম দিতে পার।

সব সময়েই তার চিত্তবিনোদনের জন্য যে এসব দরকার হোত তা নয়। সে চাইত সবার উপর টেক্কা দিতেঃ পরিবারকে পরিবার ধ্বংস করার চাইতেও তার রূপ হত আরও ভয়ংকর।

গোয়েন্দাদের একটা মস্তবড় জাল সে তৈরী করেছিল। সে শিকারী, তার তাঁবে মস্তবড় এক কুকুরের দল। শিকারও চলল। নিছক শিকারের আনন্দেই মাঝে মাঝে সে শিকার করত। জেরা করতে সে ভালবাসত না, তার আনন্দ গ্রেফ্তারে। তার হুকুমের অপেক্ষায় বন্দীরা দাঁড়িয়ে আছে, সেইখানেই তো তার চরম আনন্দ। একবার সে প্রাহার দুশো কণ্ডাক্টার, বাস আর মোটর চালককে গ্রেফ্তার করল, তাদের সে পথের মাঝখানে জড়ো করল। পথ চলাচল বন্ধ, যানবাহন ব্যবস্থা অচল, চারদিকে ভীতি। তখন সে কি খুশি! দেড়শো জনকে সে ছেড়ে দিল। মনে তার আনন্দ, দেড়শোটা পরিবার তাকে দয়ালু বলে মনে করবে, তাকে নিয়ে আলোচনা করবে।

সে চুনোপুঁটিই ধরেছে, কিন্তু তার জটিলতা তাই বলে কম নয়, তারই নানা ডালপালা বেরিয়েছে তদন্তের সময়। আমিই অবশ্য এর মধ্যে স্বাতন্ত্র দাবি করতে পারি। ওর হাতে হঠাৎ ধরা পড়লাম।

—আমার সব চাইতে বড় আসামী তুমি। প্রায়ই আমাকে সে বলত। সে গর্বিত, বড় বড় মামলার একটা তার হাতে এসে পড়েছে। এতে আমার জীবনের আর কয়েকটা দিন বাড়তেও পারে।

আমরা পরস্পরকে মিথ্যে কথা বেশ জোর দিয়েই বলতাম, সারাদিনই মিথ্যের জাল বোনা চলত, তবু দুজনের বলার একটু তফাৎ ছিল। তফাৎ এই যে, ও যখন মিথ্যে বলত, বুঝতে পারতাম, কিন্তু ও প্রায়ই আমার মিথ্যে ধরতে পারত না। একটা মিথ্যে ধরা পড়লে দুজনেই চুপ করে যেতাম, আমাদের মধ্যে এই বোঝাপড়াটুকু হয়েছিল। আমার মনে হোত, ও সত্য আবিষ্কার করতে চায় না, ওর এতবড় মামলাটা টিকিয়ে রাখাই ওর ইচ্ছে।

জেরার সময় শুধু লাঠি আর অস্ত্রই ও ব্যবহার করত না, বরং লোক বুঝে ভয় দেখানোর চাইতে বোঝানোর দিকে নজর ছিল বেশী। প্রথম রাত ছাড়া ও আমার উপর আর অত্যাচার করেনি। অত্যাচার করবার দরকার হলে অন্যের কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিত।

আর সবার চাইতে ও কৌতূহল জাগাত বেশি, কেমন যেন কাজে লাগাতেও জানত। প্রায়ই আমরা ব্রানিকে যেতাম, কোনও পানশালায় বসে দুজনে পথের দিকে তাকিয়ে দেখতাম। ঢেউয়ের মতো বয়ে যেত জনতা।

সে হঠাৎ বলে উঠত, যেন ওদের দেখেই ওর মনে হয়েছে এমনি ভাবেই বলতঃ

—তোমাকে আমরা গ্রেফ্‌তার করেছি, কিন্তু দেখ, কিছুই বদলায়নি। আগে যেমন চলত, তেমনি ওরা চলেছে পথে, নিজেদের সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, কখনও বা হাসছে,—ঠিক তেমনি। তুমি যে কখনও এখানে ছিলে একথাও বুঝি কারও মনে নেই। পৃথিবী চলছে। এদের মধ্যে তোমার পাঠক-পাঠিকাও আছে, কিন্তু তাদের মুখে কি তোমার জন্য একটিও বেশি বলি-রেখা পড়েছে?

কখনও কখনও সারাদিন জেরা করবার পর ও আমাকে গাড়িতে চড়িয়ে নেরুদা স্ট্রীট দিয়ে নিয়ে যেত রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত।

—জানি তুমি প্রাহাকে ভালবাস। দেখ, দেখ! এখানে কি আবার ফিরে আসতে চাও না? কি সুন্দর প্রাহা—তুমি চলে গেলেও সে এমনি সুন্দরই থাকবে।

প্রলুব্ধকারীর ভূমিকায় সে ভালই অভিনয় করত।

শেষ-গ্রীষ্মের সন্ধ্যা, নিঃশ্বাসে তার হেমন্তের সঙ্কেত। প্রাহার উপর ছড়িয়ে পড়ছে সন্ধ্যার নীলাভ জ্যোতি, আর মিহি কুয়াশা। সুপক্ক আঙুরের মতোই উজ্জ্বল, তেমনি মাদক সন্ধ্যা। আমি তাকিয়ে ছিলাম, দেখার এ কামনা বুঝি পৃথিবীর অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত থাকবে...কিন্তু ওকে বাধা না দিয়ে পারলাম না। বললামঃ

—তোমরা চলে গেলে প্রাহা আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।

সে হাসল, হাসিতে নীচতা নেই, বিষণ্ণতার আমেজঃ

—তুমি হিংসে করছ আমাদের।

মাঝে মাঝে সেই সন্ধ্যার কথা সে তুলত। আমার কথা তুলে বলতঃ আমরা চলে গেলে।... তাহলে তুমি আমাদের বিজয়ের আশা করো না?

সে স্থিরনিশ্চয় নয় বলেই জিজ্ঞেস করত। যখন অজেয় সোভিয়েটের শক্তির কথা বলতাম, কান পেতে শুনত। আমার জেরার পালা তখন শেষ হয়ে এসেছে।

পাৎলুন বাঁধবার ফিতের কথা

আমার মুখোমুখি সেলের দরজার পাশে পাৎলুন বাঁধবার ফিতেগুলো ঝুলছিল। পুরুষদের ব্যবহারের সাধারণ জিনিস। এই জিনিসটা কখনও আমার পছন্দ নয়। তবু আজ তাকিয়ে দেখছি, বেশ ভালোই লাগছে। যখনই

আমাদের সেলের দরজা খুলে যায়, ঐ দিকেই তাকিয়ে থাকি। ওদের ভিতরে যেন ক্ষীণ আশা দেখতে পাই।

যখন ওরা তোমাকে গ্রেফতার করবে, তোমাকে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলতেও পারে, কিন্তু প্রথমেই ওরা তোমার গলাবন্ধ, কোমরবন্ধ, আর পাৎলুনের ফিতে কেড়ে নেবে যাতে তুমি না গলায় ফাঁসী দিতে পার (অবশ্য, গলায় তোয়ালে বেঁধেও ঠিক অমনি করে মরা যায়)। যতদিন পর্যন্ত গেস্টাপো আদালত থেকে তোমাকে বেগার খাটানো বা বন্দী-শিবিরে চালান দেওয়ার হুকুম না হয়, বা তোমার মৃত্যুদণ্ড না আসে ততদিন পর্যন্ত মৃত্যুর এই যন্ত্রগুলো জেল আফিসে জমা থাকে। তারপর, তোমাকে ডেকে জিনিস-গুলো বেশ আফিসী কেতাতেই ফিরিয়ে দেবে—ইচ্ছে করলে এগুলো তুমি সেলে না নিয়েও যেতে পার। সেলের দরজার পাশে হয়তো টাঙিয়ে রাখলে, কখনও বা বাইরের রেলিং-এ ঝুলিয়ে দিলে। তোমার গাড়ি যতদিন না ছাড়বে, ততদিন এগুলো এমনিধারা ঝুলবে। সেলের একজন বাসিন্দে অনিচ্ছায় চলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে তারই সাক্ষ্য দেবে।

যেদিন গাস্তিনার ভাগ্যের কথা জানতে পারলাম, সেইদিনই মুখোমুখি সেলের দরজায় দেখা দিল ফিতেগুলো। আমার ওপাশের সেলের বন্ধুটিও চলেছে বেগার খাটতে, গাস্তিনার সঙ্গে একই গাড়িতে যাবে। দল এখনও যায়নি, হঠাৎ তাদের যাত্রা স্থগিত হয়ে গেছে। ওরা বলে, যেখানে যাচ্ছে সেখানে নাকি বোমা পড়ে তছনছ হয়ে গেছে। (সুখবর) কবে যাবে কে জানে, আজ সন্ধ্যায়, হয়তো কাল, হয়তো বা একহপ্তা বা দুহপ্তা পরেও হতে পারে। এখনও ঝুলছে ফিতেগুলো। যতক্ষণ ও-গুলো দেখতে পাব, বুঝব গাস্তিনা এখনও প্রাহায় আছে। তাই দেখছি, খুশি হচ্ছি, এই ফিতেগুলো যেন ওকে সাহায্যই করছে। একদিন, দুইদিন তিনদিনের বিশ্রাম তারা ওকে দিয়েছে...কে জানে এই ক'টা দিনের কত মূল্য? হয়তো তার মুক্তির মুহূর্তও ঘনিয়ে আসতে পারে এরই ভিতরে।

এমনি করেই আমরা এখানে বেঁচে আছি। গত বছর, গত মাস; আজ, আগামী কাল,—আমাদের চোখ শুধু আগামী কালের দিকে তাকিয়ে আছে। সে-ই তো আমাদের আশা। তোমার ভাগ্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, কাল বাদে পরশু তোমাকে গুলী করে হত্যা করা হবে—কিন্তু সেই পরশুর ভিতরে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে! শুধু আগামী কাল পর্যন্ত বেঁচে থাক, সব হয় তো বদলে যাবে। সব কিছু এমনি ক্ষণিকের, কে জানে কাল কি ঘটবে? আগামী কাল চলে যায়; হাজার হাজার মানুষ লুটিয়ে পড়ে—তাদের জন্য তো আর আগামীর প্রতিশ্রুতি রইল না। কিন্তু যারা বেঁচে থাকে, তাদের তখনও অদম্য আশা—কে জানে কাল কি ঘটবে?

মনের যখন এমনি অবস্থা তখন বাজে গুজব শুরু হয়। প্রতি হপ্তায় যুদ্ধ সমাপ্তির কাহিনী শোনা যায়—সে কি কাহিনী! গোলাপী স্বপ্ন সে নিয়ে আসে। সবাই হেসে হেসে একই গল্প করে। প্রতি হপ্তায় প্যানক্রাটস্ থেকে এক নতুন আশার ফিসফিসানি ওঠে, সবাইকে চঞ্চল করে তোলে। আর আমরা বিশ্বাস করে নিই। এরই বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, মিথ্যে আশা তো চরিত্রের দৃঢ়তা বাড়ায় না, মানুষকে দুর্বল করে ফেলে। আশাবাদ কখনও মিথ্যেকে অবলম্বন করে চলতে পারে না, সত্যের উপর তার ভিত্তি, সত্যই তো শুধু যুদ্ধ সমাপ্তির স্পষ্ট ছবি আঁকতে পারে। হ্যাঁ, যুদ্ধ শেষ হতে পারে একমাত্র উপায়ে, সে-ই তা শুধু বুঝতে পারে। সত্যের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে তোমার মনের অন্তঃস্থলে আর এই বিশ্বাসই একদিন নির্দিষ্ট রূপ নিয়ে দেখা দেবে। তারপর এমন একদিন আসবে, যে দিন তোমাকে জীবন আর মৃত্যুর সীমারেখা উত্তীর্ণ করে দেবে। যে-জীবনকে ত্যাগ করতে আজ তুমি চাইছ না, যে-মৃত্যু তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে তার বহু ঊর্ধ্বে নিয়ে যাবে তোমাকে।

মানুষের জীবনে দিনগুলোর সংখ্যা খুব বেশি নয়। তবু তুমি সেগুলো দ্রুত নিঃশেষ করে দিতে চাও। হ্যাঁ, দ্রুততর হোক তার গতি, যতদূর সম্ভব হয় তাই তো ভালো। পলায়মান সময়, অবাধ্য সময়, মানুষের জীবনকে ক্ষইয়ে দেয়, অথচ সেই তো এখানে তোমার পরম বন্ধু। কি অদ্ভুত!

আগামী কাল এখন গত। আগামী পরশু এখন বর্তমান—সেও চলে গেল। তবু ফিতে ঝুলছে আমার মুখোমুখি সেলের দরজার পাশে।

ছয়

সামরিক আইন, ১৯৪২ সাল

২৭শে মে, ১৯৪৩ সাল,

ঠিক এক বছর আগের কথা।

সেদিন আর একবার উৎপীড়নের পর ওরা আমাকে 'ছবিঘরে' নিয়ে এল। এই আমাদের প্রতিদিনের বাঁধাধরা পথ; নিচে চারশো নম্বরে নিয়ে যায় খাওয়াতে, প্যানক্রাটস্ থেকেই খাবার আসে—তারপর ফিরিয়ে নিয়ে যায় আবার পাঁচতলায়। কিন্তু সেদিন দুপুরে ব্যতিক্রম ঘটল। ওরা দুপুরের পর ফিরিয়ে নিয়ে গেল না।

বসে খাচ্ছ তুমি। বেঞ্চগুলো কয়েদীতে ভরতি, চামচে নিয়ে ব্যস্ত তারা, খাবার চিবুচ্ছে। হাঁ, এখনও ওরা মানুষের মতোই খাচ্ছে। কাল যারা মরে যাব তারা হঠাৎ যদি কঙ্কাল হয়ে দেখা দিই, মাটির ভাঁড়ে চামচের ঐ টুং টাং যদি হাড়ের ঠকঠকানি হয়ে দেখা দেয়—কেমন হবে তা হলে? না, আজ সেকথা কেউ ভাবছে না, এমন কি সে সন্দেহের ছায়াও নেই। আর এক সপ্তাহ, আর এক মাস কি আর এক বছর বাঁচবার জন্য শরীরটাকে পুষ্ট করছি।

এখানে আবহাওয়া এখন ভালো—হাঁ তা বলা যায় বই কি। হঠাৎ একি হোল! কেমন এক হাওয়া উঠল, সব শান্ত, কিন্তু সে শান্তি তো অসহ্য। শুধু রক্ষীদের মুখ দেখে বোঝা যায় কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে। প্রমাণও পাওয়া গেল। ওরা আমাদের বাইরে ডেকে এনে সারবন্দী করে দাঁড় করিয়ে দিল, তার পর নিয়ে গেল প্যানক্রাটস্-এ। দুপুরে প্যানক্রাটস্ এ ফেরা! আগে তো কখনও তা হয়নি। জেরার অত্যাচার সহ্য করতে হোল না; জেরায়-জেরায় তো আমরা ক্লান্ত হয়ে গেছি, উত্তর আর খুঁজে পাই না। আজ যে আধদিনের জন্য নিষ্কৃতি পেলাম এ ভগবানের দান। কিন্তু তা তো নয়।

বারান্দায় দেখা হোল জেনারেল এলিয়াস-এর সঙ্গে। আগে রক্ষক সরকারের (প্রটেক্টরেট) প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, ইনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তার চোখে মুখে উত্তেজনা, রক্ষীদের পরিবেষ্টনী ভেদ করে তিনি আমাকে দেখতে পেলেন। কাছে এসে কানে কানে বললেনঃ

সামরিক আইন জারি হয়েছে।

আমার নৈর্বক্তিক প্রশ্নের উত্তর দেবারও তার সময় হোল না। বন্দীরা বিশেষ সংবাদ জানাবার কতটুকু সময় পায়! মুহূর্তের ভগ্নাংশের চাইতে তো বেশি নয়।

প্যানক্রাটস্-এর রক্ষীরা আমাদের তাড়াতাড়ি পেটচেক থেকে ফিরতে দেখে খুবই অবাক হয়ে গেল। যে রক্ষীটি আমাকে সেলে নিয়ে এল, সে তো অভয় দিয়ে আমাকে কি হয়েছে জানতে চাইল। জানি না লোকটি কে, কিন্তু তার মাথা নাড়ার ভঙ্গিটি মনে আছে। সে সামরিক আইনের কথা কিছুই জানত না,—অথবা আমার প্রশ্নই শুনতে পেল না। হয়তো—হ্যাঁ, এই ভাবেই নিজের মনের উদ্বেগ শান্ত করতে হোল।

সেদিন সন্ধ্যায় সে আবার এসে আমার সেলের ভিতরে উঁকি মারল।

—ঠিকই বলেছ, হেড্রিখকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল। সাংঘাতিক জখম হয়েছে। প্রাহায় জারি হয়েছে সামরিক আইন।

পরদিন ভোরে বারান্দায় আবার সারবন্দী করে দাঁড় করাল আমাদের। আবার জেরার উৎপীড়ন সইতে যেতে হবে। কমরেড ভিকটর সিনেক আছেন আমাদের দলে, পার্টির কেন্দ্রীয় পরিষদের শেষ জীবিত সদস্য, ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারীতে তিনি গ্রেপ্তার হন। ঢ্যাঙা এস-এস উর্দিপরা টার্নকি তার চোখের সমুখে একটুকরো সাদা কাগজ নাড়তে লাগলঃ কাগজের উপর বড় বড় হরফে ছাপাঃ

মুক্তির হুকুমনামা

কেমন যেন হাসছেঃ বর্বর হাসি তার মুখে।

দেখছ তো, ইহুদী হলেও বেঁচে গেলে। মুক্তির হুকুমনামা!... এবার সে আঙুল দিয়ে নিজের গলা চেপে ধরে জানিয়ে দিল ভিকটরের মাথাটা এমনি করে উড়ে যাবে। ১৯৪১ সালের সামরিক আইনে প্রথম শহীদ অটো সাইনেক। ১৯৪২ সালের সামরিক আইনের প্রথম বলি হোল তারই ভাই ভিকটর। ওরা ওকে নিকেশ করবার জন্য মাউথাউসেনে নিয়ে গেল, হাঁ ওদের বিশুদ্ধ পরিভাষায় তাই-ই বলে বটে।

প্রত্যহ প্যানক্রাটস্ থেকে পেটচেক বিল্ডিং-এ যাওয়া আর ফিরে আসা সুরু হোল হাজার হাজার বন্দীর। নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। বাসের ভিতরে এস্-এস্ রক্ষীরা হেড্রিখের 'মৃত্যুর প্রতিশোধ' নিতে লাগল। আধমাইল যেতে না যেতেই পিস্তলের কুঁদোর আঘাতে বহু বন্দীর মুখ দিয়ে ঝরল রক্ত। আমার সহযাত্রীদের অবশ্য বেশী সইতে হয়নি। কারণ আমার দাড়ির উপরই তাদের নজর পড়ত বেশী। নানা রকম ঠাট্টাও চলত, তাই সহযাত্রীদের

পেটবার সময় ওরা কমই পেত। গাড়ি যখন ঝাঁকুনি খেয়ে চলত, রক্ষীরা আমার দাড়ি ধরে ঝুলে পড়ত, যেমন করে বাসের রবারের বন্ধনী ধরে ঝুলে থাকে যাত্রীরা। এই ছিল এদের অবসর বিনোদনের প্রিয় খেলা। আমার উৎপীড়নের এ যেন এক মহড়া বা প্রস্তুতি। রাজনীতিক পরিস্থিতি বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপীড়নের পদ্ধতিও বদলে যেত। কিন্তু শেষ হোত সেই একই ভাবেঃ

কাল যদি তোমার চেতনা ফিরে না আসে তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে।

কিন্তু এখন তো আর ভয় নেই। তুমি শুনতে পাবে, প্রতি সন্ধ্যায় ওরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে নামের পর নাম বলে যাচ্ছে। পঞ্চাশ, একশো কি দুশজন লোকের এক মুহূর্তে হাত পা বাঁধা পড়বে, তারপর তাদের তুলে নেওয়া হবে গাড়িতে, কসাইখানার জন্তুদের মতো হত্যা করতে নিয়ে যাবে কোর্বিলিসিতে। হাঁ, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি? প্রথমতঃ তাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় নি। তাদের গ্রেফ্তারের পর প্রধান প্রধান ব্যাপারের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আবিষ্কার করা যায়নি, তদন্তের আর কোনও প্রয়োজন নেই। এবার তাই এল হত্যার হুকুম। একজন কমরেড ন'জন লোকের কাছে একটা বিদ্রুপাত্মক কবিতা পড়ে শুনিয়েছিল তারই ফলে দুমাস আগে তাদের সবাইকে গ্রেফ্তার করা হয়। এখন ওরা মৃত্যু-সেলে অপেক্ষা করছে—পরোয়ানা এলেই হয়। গোপন ইশ্তেহার বিলির সন্দেহে একজন স্ত্রীলোককে দুই মাস আগে গ্রেফ্তার করা হয়েছিল। সে তার অপরাধ স্বীকার করেনি, কোনও প্রমাণও মেলেনি। কিন্তু তবু ওরা তার ভাই বোনদের, ভাইদের স্ত্রীদের, বোনের স্বামীদের কয়েদ করেছে, তাদের হত্যাও করবে তারা—এমনি করে সন্দেহভাজনদের পরিবার-কে-পরিবার তারা নির্মূল করে দেবে। হাঁ, সামরিক আইনের এই-নীতি। ভুল করে ওরা একদিন পোস্টঅফিসের এক পিওনকে ধরে এনেছিল, সে এখন বারান্দায় মুক্তির হুকুমের জন্য অপেক্ষা করছে। তার নাম ডাকলো ওরা, তাকে নিয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের সারে দাঁড় করিয়ে দিল, তার পর গাড়িতে তুলে চালান দিল। গুলী করে হত্যাও করল। পরের দিনই আবিষ্কার করল ভুল হয়েছে, ঐ নামের আর একজনকে গুলী করে মারবার কথা ছিল। তাকেও গুলী করা হোল, ব্যাস্ সব ঠিক! বিচার করে গুলী করবার সময় কোথায়? আর তার দরকারই বা কি—যখন গোটা জাতিকে হত্যা করাই তাদের সংকল্প?

সেদিন 'শুনানি' থেকে দেরী করেই ফিরছিলাম। দেখি দেয়ালের কাছে ভ্লাচিমির ভানচুরা দাঁড়িয়ে আছেন। সামান্য জিনিসপত্রের বাণ্ডিল তাঁর পায়ের কাছে। (চেক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একজন প্রতিভাবান শিল্পী তিনি)।

আমি জানি, এই দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ কি, তিনিও জানেন। এক মুহূর্তের জন্য ওর হাত মুঠোয় চেপে ধরলাম। এখনও উপরের বারান্দা থেকে ওকে দেখতে পাচ্ছি, দাঁড়িয়ে আছেন, মাথাটা একটু নুয়ে পড়েছে, তাকিয়ে আছেন। সুদূরপ্রসারী তাঁর দৃষ্টি—আমাদের জীবন পার হয়ে সে দৃষ্টি চলে গেছে। আধঘণ্টা পরে ওরা তাঁর নাম ধরে ডাকল।...

ক'দিন পরে মিলোশ এসে দাঁড়ালেন ঐ দেয়ালের সামনে—ঠিক মুখোমুখি। বিপ্লবের সাহসী যোদ্ধা, গত অক্টোবরে গ্রেফতার হয়েছেন। নিঃসঙ্গ বন্দীজীবন আর উৎপীড়নে ভেঙে পড়েন নি। দেয়ালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি পেছনের রক্ষীকে কি বোঝাচ্ছিলেন। হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে হাসলেন, দৃষ্টি ঊর্ধ্বে—বিদায় সম্ভাষণই জানালেন। তারপর আবার রক্ষীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেনঃ

—এতে তোমাদের কোন সুবিধেই হবে না। আমরা মরব, কিন্তু শেষে তোমরাই হেরে যাবে।...

তারপর আর একদিন দুপুরে। আমরা সেদিন পেটচেক বিল্ডিং-এর নিচুতলায় খাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওরা এলিয়াসকে নিয়ে এল, তার বগলে একখানা খবরের কাগজ। তিনি কাগজখানা দেখিয়ে হাসলেন। তিনি এইমাত্র কাগজখানায় পড়েছেন এই হত্যার সঙ্গে তার নাকি সম্পর্ক আছে (অথচ আজ আট মাস তিনি জেলখানায়)।

—সব ঝুটা। তিনি এই বলে খেতে লাগলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় প্যানক্রাটস্-এ ফিরে আসবার সময় তিনি এই নিয়ে ঠাট্টাই করলেন। একঘণ্টা পরে তাঁকে সেল থেকে নিয়ে গিয়ে ওরা কোবিলিসির বধ্যভূমিতে চালান করে দিল।

শবের স্তূপ গড়ে উঠেছে, এখন আর দশ বিশ বা শ'য়ে গোনা চলে না, হাজারে উঠেছে অঙ্ক। পশুদের নাকে তাজারক্তের গন্ধ। ওরা দুপুর রাতে, এমন কি রোববারেও ওদের 'কাজ' করছে। সবারই পরনে এস্ এস্-এর উর্দি। এ যেন তাদের উৎসব—হত্যার উৎসব। ওরা শ্রমিক, শিক্ষক, কৃষক, লেখক, পদস্থ রাজকর্মচারী—সবাইকে পাঠাল মৃত্যুমুখে,—পুরুষ, নারী, শিশু বাদ পড়ল না, পরিবারের পর পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, উৎখাত আর ভষ্মীভূত হোল, গ্রামের পর গ্রাম। প্লেগের মতো ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে মৃত্যু, তার কাছে কোনও বাছবিচার রইল না।

কিন্তু এই ভীতির ভিতরেও মানুষ বেঁচে আছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, কিন্তু তবু তারা বেঁচে আছে, খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, প্রেম করছে, কাজ করছে, হাজার রকম চিন্তা করছে। মৃত্যুর সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই।

তাদের মনেও আলোড়ন উঠেছে, কিন্তু তারা তবু সহ্য করছে। তারা মাথা নোয়াচ্ছে না, নুয়েও পড়ছে না।

সামরিক আইনের পালা চলছে এমনি সময় আমার কমিসার আমাকে একদিন ব্রানিকে নিয়ে গেল। সুন্দর জুন মাস, লিংডেন আর বিলম্বিত আকাশিয়ার পুষ্পস্তবকের গন্ধে উতলা, আমন্থর। রোববারের দুপুর, পথে গাড়ির সার—তারই ভিতর দিয়ে আসছে ভ্রমণকারীদের মিছিল—পথ এত সরু, ভিড় জমে উঠেছে। ওরা উৎফুল্ল, সোরগোল তুলেছে, সারাদিন সূর্য আর সমুদ্রে আর প্রেমিকার আলিঙ্গনে কাটিয়ে ক্লান্ত। বিলাসের ক্লান্তি। মৃত্যুর কলঙ্ক রেখা পড়েনি ওদের মুখে, তবু মৃত্যু ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদেরই ভিড়ে, মাঝে মাঝে ওদেরই কাউকে লক্ষ্য করে আসছে আঘাত। খরগোসের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, তেমনি চতুর তারা। হাঁ, খরগোসের মতই। ওদের ভিড়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তোমার সান্ধ্যভোজের জন্য একটাকে ধরে ফেল! ক্ষণিকের জন্য তারা এক কোণে জড়সড়ো হয়ে থাকবে, তারপর আবার নিজেদের আনন্দ আর উদ্বেগ নিয়ে ছুটে চলবে—জীবনের আনন্দে ওরা পূর্ণ।

জেলখানার উঁচু দেয়ালবন্দী জীবন থেকে হঠাৎ এসে হাজির হলাম মানুষের এই উদ্দাম মিছিলে, এদের আনন্দের প্রথম মধুর আস্বাদ তেতো হয়েই দেখা দিল।

কিন্তু তাতো ঠিক নয়।

এখানে যা দেখছি সেওতো জীবন, যেখান থেকে এইমাত্র এলাম সেওতো জীবন। যত উৎপীড়নই হোক না, জীবন তো অবিনশ্বর। তাতে উৎপীড়ন চলবে একপ্রান্তে আর শত শত প্রান্তে সেই আবার প্রস্ফুটিত হবে। হাঁ, এই তো জীবন, মৃত্যুর চাইতে শক্তিশালী। সে কি তেতো হতে পারে?

আমরা যারা সেলে বন্দী—ভীতির মাঝেই যারা বাস করছি, তারা কি জাতির থেকে আলাদা, ভিন্ন ধাতুতে গড়া?

মাঝে মাঝে প্রায়ই পুলিসের গাড়িতে চড়ে শুনানিতে যেতাম। রক্ষীর ব্যবহার বেশ ভদ্র ছিল। জানালা দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে দেখতাম, দোকানের শো-কেস, ফুলের দোকান, পথের ভিড়, মেয়েরা—কেউই বাদ পড়ত না। একদিন আপন মনে বললাম, যখনই ন' জোড়া সুন্দর সুঠাম পা গুণব, সেদিন আর আমার মৃত্যুর আদেশ আসবে না। তার পর তাকিয়ে দেখতাম, পায়ের সুঠাম রেখা, তা নিয়ে বিচার করতাম। অদম্য কৌতূহলে কিছু পছন্দ করতাম, কিছু বা ভালো লাগতো না। তখন একবারও ভাবতাম না যে এরই ওপর নির্ভর করছে জীবন। তখন আমার কৌতূহল শুধু সুঠাম রেখায়, জীবনে নয়।

ওরা আমাকে রোজই দেরি করে সেলে নিয়ে আসত। 'বাবা' পেসেক রোজই ভাবতেন, আমি বুঝি আর ফিরে আসব না। ফিরে এলেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরতেন আর তার কাছে আমি সেদিনের শোনা খবরগুলো বলতাম। গত রাত্রে কোবিলিসির বধ্যভূমিতে কে লুটিয়ে পড়ল সেই খবর। তারপর খিদের জ্বালায় জঘন্য দলা দলা শুটকি শাকশব্জি খেতাম। কখনও বা আনন্দে গান গাইতাম, কখনও বা রাগে দুঃখে মুষড়ে পড়লে পাশা নিয়ে বসতাম। খানিক্ষণের জন্য সব কিছু ভুলে থাকতাম আমরা। এমনি করেই কাটত সন্ধ্যা, যে কোনো মুহূর্তে খুলে যেতে পারত জেলের দরজা, আমাদের কারও মৃত্যুর পরোয়ানা এসে হাজির হতেও পারত।

—হয় তুমি, না হয় ও—নিচে চল। সব জিনিসপত্র তুলে নাও। জল্দি কর।

কিন্তু সামরিক আইনের পর্যায়ে ডাক পড়ল না। আমরা সেই ভীতির যুগ কাটিয়ে এলাম। তখনকার অনুভূতির কথা আজ ভাবতেও অবাক লাগে। মানুষ কি অদ্ভুতভাবে গড়া—অসহনীয়কে সইবার শক্তি আমাদের আছে।

কিন্তু সেই দিনগুলি যে গভীর ছাপ রেখে গেল আমাদের জীবনে, তা তো মুছে ফেলতে পারছি না। আমাদের মগজের সূক্ষ্ম তন্তুর নিচে ফিল্মের কাঠিমের মতো তারা রইল, পরবর্তী বাস্তবজীবনে সেই কাঠিমগুলো হয় তো খুলে যাবে, উন্মত্ততা এসে দেখা দেবে—অবশ্য ততদিন যদি বেঁচে থাকি। অথবা তারাই বিরাট কবরখানা হয়ে দেখা দেবে, অথবা শ্যামল উদ্যান হয়ে—মানুষের অমূল্য জীবনের মহামূল্য বীজ পোঁতা হবে সেখানে।

সেই মহামূল্য বীজ থেকে অঙ্কুর হবে, সেই অঙ্কুর জীবন হয়ে দেখা দেবে একদিন।

প্যানক্রাটস্

জেলখানার জীবন দুরকম। এক জীবন সেলে বন্ধ পৃথিবী থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন—তবুও পৃথিবীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—অন্তত রাজবন্দীদের সম্পর্কে তো বটেই। আর এক জীবন ছড়িয়ে আছে লম্বা বারান্দায় সেলের সুমুখে—এক সুসংবদ্ধ জীবন শ্বাসরোধী আধো আঁধারে ফুটে উঠেছে—সেলের জীবনের চাইতেও সে নিঃসঙ্গ—মানুষের সেখানে ভিড়, তা হলেও তার নিঃসঙ্গতা আছে বই কি। এই জীবনই এখানে বর্ণনা করব।

এর জীবজন্তু আলাদা, ইতিহাস আলাদা। তা না হলে আমি তো তা নিয়ে গবেষণা করতাম না। আমি তা হলে শুধু আমাদের মঞ্চের সুমুখের দৃশ্যসজ্জাই দেখতে পেতাম, দেখতে পেতাম তার উপরের শক্ত অনমনীয় আবরণ, আর সেই আবরণ সেলের বাসিন্দেদের অবিরত কেমন করে পিষছে তাই-ই জানতাম। একবছর, এমন কি ছ'মাস আগেও তাই মনে হোত। কিন্তু এখন আমি আবরণের ভিতরে বহু ফাটল আবিষ্কার করেছি, সেই ফাটল দিয়ে মুখ দেখা যায়। সব রকম মুখই আছে, কিন্তু মানুষেরই সে মুখ। রাজানুশাসনের পীড়ন সেই ম্লান পৃথিবীর সবার উপরে সাঁড়াশির মতো চেপে বসেছে, আর তারই পীড়নে তাদের মানসিক বৃত্তিগুলো আবিষ্কৃত হচ্ছে। তাও বুঝি কম, কারো কারো মন বুঝি আরও বড়। সেই অনুসারেই তো তাদের প্রভেদ, এক একটা বিশিষ্ট চরিত্রও সৃষ্টি হচ্ছে। এখানে তুমি ক'জন খাঁটি মানুষেরও দেখা পেতে পার। তারা যে অন্যকে সাহায্য করছে, তার জন্য এ-রাজ্যের অনুশাসনের পীড়নের দরকার নেই।

জেলখানা সুন্দর প্রতিষ্ঠান নয়, সেলের সুমুখের জগত সেলের ভেতরের জগতের চাইতে অনেক কুশ্রী। এখানে আছে আঁধার। সেলে বন্ধুত্বের স্থান আছে—সে কি বন্ধুত্ব! বিপদের মুখে সীমান্তে দেখা যায় এমনি বন্ধুত্ব—যখন তোমার জীবন আজ আমার হাতে, কাল আবার তোমার হাতে চলে যেতে পারে। কিন্তু এই রাজ্যের রক্ষীদের ভেতরে বন্ধুত্বের কোনও বন্ধনই নেই। না, থাকতে পারে না। তাদের চার দিকে ঘিরে আছে হীন গোয়েন্দাগিরির পরিবেশ, একে অন্যের উপর তম্বি করছে, যাদের তারা সরকারি সুবাদে

'সাঙাৎ' বলে ডাকে তাদের সম্বন্ধেই তারা সর্বদা সজাগ। তাদের মধ্যে যারা ভালো, যারা বন্ধুত্ব ছাড়া বাঁচতে পারে না, তারা সেলের ভিতরে তা খুঁজে পায়।

বহুদিন ওদের নাম আমরা জানতে পারিনি, ওরাও আমাদের নাম জানত না। তাতে অসুবিধে হয়নি, নিজেদের মধ্যে আমরা ওদের এক একটা ডাক-নাম দিয়েছিলাম। কারো নামকরণ আমরাই করেছি, বা আমাদের আগে যাঁরা ছিলেন তাদের দেওয়া নামও উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা ব্যবহার করেছি। এক এক সেলে এক এক জনের এক এক নাম।—এরা সাধারণ জীব, বিশেষ কিছু নয়। কোনও সেলে এরা হয় তো একটু আধটু যত্ন করে, কোথাও বা চড় চাপড় মারে। কয়েদীদের সংগে এক মুহূর্তের সম্বন্ধ, তারই ভিতরে স্থায়ী ছাপ রেখে যায় কয়েদীদের মনে। একপেশেই সে ছাপ, তারই ফলে নামকরণ হয়। কখনও কখনও সবগুলো সেলেই একই নামকরণ করে। যাদের এমনি নাম, ভালো মন্দ যাই-ই হোক তাদের কতকগুলো চোখে-পড়বার মতো বৈশিষ্ট্য আছে।

এবার এই জীবগুলিকে দেখা যাক। খুঁদে মানুষগুলোর দিকে তাকাও। এ সংগ্রহ খেয়াল খুশিতে সম্ভব হয় নি। এরা নাৎসীবাদের সেনাবাহিনীর অংশবিশেষ। রাজ্যের স্তম্ভ এরা, এদের তাই সাবধানে নির্বাচন করতে হয়েছে। ওদের সমাজের অবলম্বন এরা—

ফার্স্ট—এইড দেয় যে লোকটি

ঢ্যাঙা, মোটা এস্ এস্-এর বাড়তি লোক। স্বরটা কেমন মিহি যেন তার। নাম রিউস, রাইন নদীর পারে কোলনে ও ছিল এক স্কুলের দরোয়ান। আর আর জার্মান স্কুলের দরোয়ানদের মতোই ফার্স্টএইড দিতে শিখেছিল। তাই মাঝে মাঝে জেলের কাজও পেত। ওর সংগেই এখানে আমার প্রথম পরিচয়। ও আমাকে সেলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে খাটিয়ায় শুইয়ে দিয়েছিল, আমার ক্ষতস্থানে সেঁকও ওই দেয়। হয়তো আমার জীবন ওরই সাহায্যে বাঁচে। এর মানে কি? এ কি তার মানবতাবোধ না তার ফার্স্ট-এইড শিক্ষার ফল? জানি না। কিন্তু যখন সে বন্দী ইহুদীদের দাঁতে ঘুষি মেরে ভেঙে ফেলত অথবা গাদা গাদা চামচে ভরতি নুন বা বালি নিয়ে সর্বঔষধি দাওয়াই হিসেবে তাদের ওপর ব্যবহার করত তখন তার মানে বুঝতে তো দেরি হয়নি। তা নাৎসীবাদের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

'স্মার্ট'

মনটা ভালো, কথা বলে বেশি। নীতির দিক থেকে ফেবিয়ান বলা যায়। জেস্‌কা বুদেজোভিজের মদচোলাইয়ের কারখানার সে মোটরচালক ছিল। যখন খাবার নিয়ে সেলে ঢুকত, মুখে ফুটে উঠত হাসি; কখনও আমাদের অনিষ্ট করেনি। তোমার কখনও বিশ্বাস হবে না যে, এই লোকটি সেলের বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শোনবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা কান পেতে থাকত। একটা কিছু শুনলেই ছুটত উপরওয়ালাদের খবর দিতে।

কোকলার

সেও বুদেজোভিজের মদচোলাইয়ের কারখানা থেকে এসেছে। শ্রমিক ছিল সেখানে। সুদেতেন এলাকা থেকে এমনি বহু জার্মান শ্রমিক এসে এখানে জুটেছে। মার্কস্‌ একদা লিখেছিলেনঃ 'ব্যক্তি হিসেবে শ্রমিকের কাজ বা চিন্তাধারা বিশেষ কিছু নয়, শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকদের যে ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে তার উপর তাদের বিশিষ্টতা নির্ভর করছে।'

যাদের এখানে আমরা দেখছি, তারা তাদের শ্রেণীর কর্তব্যের কথা কিছুই জানে না। নিজের শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন আর তারই বিরোধী হয়ে তারা আদর্শগতভাবে শূন্যে ঝুলছে—শেষে হয়তো সত্যিকারের ঝোলাই ঝুলতে হবে।

সহজ আরামের মোহে সে নাৎসীদের দলে ভিড়েছিল। কিন্তু সে যা ভেবেছিল তার চাইতে এ জীবন জটিল। সেই থেকে হাসি তার নিভে গেছে। সে নাৎসীদের জিতের উপর বাজি রেখেছে, কিন্তু এখন তো মনে হয়, মরা ঘোড়ার উপর বাজি ধরা হয়েছে। তার স্নায়ুতন্ত্র এখন বিকল। রাতে যখন সে নিঃশব্দে চটি পরে বারান্দায় ঘুরে বেড়ায়, তার বিভীষিকাময় চিন্তার স্বাক্ষর সে আনমনে আলোর ঢাকনার কালির উপরে রেখে যায়।

'সবকিছু পচে গেছে, গন্ধ বেরুচ্ছে।' সে বেশ কবিত্ব করেই একটার উপর লিখেছে। তাকে পেয়ে বসেছে আত্মহত্যার কামনা।

দিনের বেলায় কয়েদী আর রক্ষীদের উপর তম্বী করে বেড়ায়, চিৎকার করে,—এমনি করেই সে তার সাহস উবে যেতে দেয় না।

রোসলার

রোগা, ঢ্যাঙা, স্বর কর্কশ—এই রোসলার। জেলখানার যে ক'জন প্রকৃত হাসতে জানে, সে তাদের একজন। জাবলোনেৎস-এর মিল শ্রমিক ছিল। সেলে ঢুকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আলাপ আলোচনা করেঃ

—কি করে এখানে এলাম? দশবছর ধরে কোনও পাকাপোক্ত কাজ ছিল না, তুমি তো জানো হপ্তায় বিশ ক্রাউনে একটা গোটা পরিবারের কি করে চলে। তারপর ওরা এসে বললে; তোমাদের আমরা কাজ দেব—আমাদের সঙ্গে এস। গেলাম ওদের সঙ্গে, কাজ জুটল আমাদের সকলের। এখন তো তবু কোনও রকমে খেয়ে বেঁচে আছি। মাথা গোঁজার ঠাঁই জুটেছে। আবার বেঁচে উঠেছি। সোশালিজম? খুব সুবিধের ব্যাপার নয়। আমার ধারণা ছিল অন্যরকম, কিন্তু আগের অবস্থার থেকে তো ভালো।

—কি তাই না? যুদ্ধের কথা বলছ? যুদ্ধ আমি চাইনি, অন্যে মরুক আমি তা চাইনি—শুধু নিজে বাঁচতে চেয়েছি।

—কি? ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছায় হোক আমি যুদ্ধে সাহায্য করছি? কি করব বল? আচ্ছা এখানে কাউকে কখনও আঘাত করেছি? আমি যদি চলে যাই, কি সুবিধে হবে? আমার জায়গায় অন্য লোক এসে হাজির হবে, তারা খারাপ লোকও তো হতে পারে। আর যুদ্ধের পর তো আমি কারখানার কাজে ফিরে যাচ্ছি।...

—কোন পক্ষ জিতবে বলতো? আমরা নয়? তাহলে আমাদের কি হবে?

—আমরা নিকেশ হয়ে যাব? সে তো ভারি খারাপ ব্যাপারই হবে তাহলে। আমি যে উল্টোটাই ভেবেছিলাম।

তারপর সে সেল থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে যায়।

আধঘণ্টা পরে আবার ফিরে এসে সোভিয়েট ইউনিয়নটা সত্যি কি রকম—সেই প্রশ্নই করে।

-

ওটা

এক সকালে আমরা প্যানক্রাটস্ কয়েদখানার সবচাইতে বড় বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, রক্ষীরা আমাদের পেটচেক বিল্ডিং-এ নিয়ে যাবে তারই প্রতীক্ষা করছিলাম। এমনি আমাদের রোজই এসে দাঁড়াতে হত। আমাদের কপাল দেয়ালের সঙ্গে লাগানো থাকত, যাতে পিছনে কি হচ্ছে কেউ দেখতে না পায়। সে দিন সকালে এক অচেনা স্বর কানে এলঃ

—আমি কিছু দেখতে চাই না, শুনতেও চাই না। আমাকে তোমরা চেন না বটে, তবে শিগগিরই পরিচয় হবে!

হাসলাম। এখানে এই ড্রিলের সময় সেই 'গুড সোলজার সিওয়েইকে'র হাবা লেফটেনান্ট ডুবকে উদ্ধৃত করছে—খুব খাপ খেয়ে গেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কারও চেঁচিয়ে ঠাট্টা করার সাহস তো হয়নি। আমার পাশের সঙ্গীটি

অভিজ্ঞ, সে আমাকে ঠেলা দিয়ে হাসতে বারণ করল। আমি হয়তো ভুলই করেছি, ঠাট্টা হিসেবে কথাটা বলা হয় নি। না, ঠাট্টা তো নয়।

আমাদের পিছনে যার স্বর শুনলাম সে এস্ এস্-এর উর্দিপরা এক খুদে জীব। সিওয়েইক সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞানই নেই। লেফটেটাণ্ট ডুবের মতো কথা বলছে, কারণ সেও তারই মতো একজন। এর নাম উইথান, বহুদিন ঊর্ধ্বতন সার্জেণ্ট হিসেবে চেকোস্লোভাক সেনা বাহিনীতে কাজ করেছে, তখন তার নাম ছিল ভিটান। সে ঠিকই বলেছিল, ওকে ভাল করেই চিনলাম, ওকে কখনও তাই উত্তম পুরুষ, অবজ্ঞার্থে 'ওটা' ছাড়া ডাকতাম না। সত্যিকথা বলতে কি, আমাদের মগজের বুদ্ধি তার একটা যুৎসই ডাকনাম বার করতে পারলো না। কি করেই বা পারবে। ও ছিল নির্বুদ্ধিতা, নীচতা, অহঙ্কার আর খাঁটি মন্দের এক অপূর্ব সমাহার। প্যানক্রাটস্ রাজ্যের এক স্তম্ভ বিশেষ।

'শুয়োরের হাঁটুর সমান হবে না'—এই সব গর্হিত জীবদের এই বলেই আমরা ডাকতাম। ওদের দুর্বলতায় এমনি করেই আঘাত করতে হয়। বেঁটে হলে মানুষ মনের দিক থেকেও নিজেকে অনেকখানি ছোট মনে করে। উইথানও সেই দুঃখ থেকে রেহাই পায়নি, আর সেই জন্যেই যারা দেহ বা মনের দিক থেকে ওর চাইতে বড় তাদের উপর ও নিয়েছে প্রতিশোধ। তার মানে ওর হাত থেকে কেউই রেহাই পাইনি—ওর মন আর দেহের দিক থেকে এখানে সবাই বড়।

ঘুষি মেরে সে প্রতিশোধ নেয় না। সে সাহসটুকুও ওর নেই। আমাদের উপর গোয়েন্দাগিরি করে আমাদের কথা উপরওয়ালার কাছে লাগিয়ে ও প্রতিশোধ নিত। উইথান গুজ গুজ ফুস ফুস করত আর কত বন্দী যে তারই ফল ভোগ করত—কত যে স্বাস্থ্য আর প্রাণ হারাল তার সীমা সংখ্যা নেই। —অবশ্য যখন প্যানক্রাটস্ ছেড়ে তুমি বন্দীশিবিরে রওনা হবে তখন তোমার কার্ডের উপর মন্তব্য কি থাকবে বা তুমি প্যানক্রাটস্ থেকে জীবনে বেরুতে পারবে কিনা—দুই-ই তোমার কাছে সমান!

ভাঁড় যাকে বলে সে ঠিক তাই। সে বারান্দায় একা একা গর্বভরে ঘুরে বেড়ায়—নিজের মহিমায় নিজেই যেন আত্মহারা। কোনো দর্শক নেই তবু তার হাঁটার ভঙ্গীটুকু বদলায় না। কারও সঙ্গে দেখা করতে গেলে, সে উঁচু কোনো জায়গা দেখে চড়ে বসে। আমাদের জেরা করবার সময় সে চেয়ারের হাতলের উপর বসে পড়ে, ঘণ্টাখানেক ধরে সে ওখানে বসে অস্বস্থি ভোগ করে। এর কারণ ওখানে বসলে তোমার থেকে ওকে অনেক ঢ্যাঙা দেখাবে। আমাদের দাড়ি কামাবার সময় ও সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়, কখনও বা একটা বেঞ্চির উপর পায়চারি করে, মুখে তার সেই এক কথাঃ

—আমি কিছু দেখতে চাই না, শুনতে চাই না, আমাকে তোমরা চেন না...

সকাল বেলা ব্যায়ামের সময় সে উঠোনের ঘাসভরা উঁচু জমিটুকুতে গিয়ে দাঁড়ায়। আমরা উঠোনে যারা আছি ওকে তাদের চাইতে অন্তত চার ইঞ্চি ঢ্যাঙা দেখায় ওখান থেকে। সেলে ও এমন ভাবে ঢোকে মনে হয় যেন মহামহিম মহারাজ এলেন। এসেই চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের পরিদর্শন সুরু করে।

একেবারে ভাঁড় যাকে বলে তাই—কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এইসব মূর্খ অতি বিপজ্জনক—বিশেষ করে মানুষের জীবন নিয়ে যাদের কারবার তারা তো বটেই। তার মূর্খতার আড়ালে একটা গুণ লুকিয়ে আছে—সে তিলকে তাল করতে পারে। পাহারাদার কুকুরের কাজটুকুই সে জানে। তাই, নিয়ম থেকে এইটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি তার কাছে বড় হয়েই দেখা দেয়, নিজের অহমিকায় সুড়সুড়ি দেবার ছল খুঁজে পায়। কয়েদখানার নিয়ম বা শৃঙ্খলা ভাঙা সম্বন্ধে তার ধারণা দেখে মনে হয়, সে নিজেকে বুঝি একজন কেউকেটা বলেই মনে করে। আর কেই বা তার এই অভিযোগের তদন্ত করবে?

স্মেতোনঝ

পুরনো ঝরঝরে জাহাজের মতো দেহ, ভাবলেশহীন মুখ আর চোখ দেখে মনে হয় যেন গ্রসের আঁকা নাৎসী-ঝঞ্ঝাবাহিনীর সৈনিকের ব্যঙ্গচিত্র একখানি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ও পূর্ব প্রুশিয়ায় লিথুয়ানিয়া সীমান্তের বাসিন্দে—গরু দোহানোর কাজ করত। কিন্তু এ বড় অদ্ভুত যে, গৃহপালিত শান্ত শিষ্ট জন্তুর কোনও বিশেষত্বই তার উপর ছাপ রেখে যায়নি। উপরে তাকে জার্মান জাতির গুণাবলীর প্রতীক বলা হয়। কঠোর, সে খুব কম কথা কয়, ঘুষ খায় না। কখনও প্রাপ্যের অতিরিক্ত খাবার দাবি করে না, কিন্তু...

কে একজন জার্মান বিজ্ঞানী এখন নাম মনে পড়ছে না, কোন জীব কতগুলি শব্দ তৈরী করতে পারে একবার তার উপরেই তার বুদ্ধির পরিমাপ করতে চেষ্টা করেছিলেন। এই থেকে তিনি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন যে, গৃহপালিত বিড়াল বুদ্ধির দিক দিয়ে সব চাইতে নিরেট। কেন না একশো আঠাশটির বেশি শব্দ উদ্ভাবন করতে সে অক্ষম। কিন্তু স্মেতোনঝ-এর তুলনায় সে মস্ত প্রতিভাধর, কারণ ওর কাছ থেকে সারা প্যানক্রাটস্ কখনও চারটে কথার বেশি শোনে নিঃ

'এই, এদিকে তাকিয়ে দেখ!' এই চারটে কথা।

হপ্তায় দু-তিনবার ওর ছুটি মিলত। কিন্তু তখন কি তার মানসিক অবস্থা! তার বিশ্রামটুকুর আনন্দ যেত উবে। জেলখানার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট একদিন তাকে জানালাগুলো খুলে দেয়নি বলে গালাগাল দিচ্ছিলেন, আমি তাকে দেখেছি। তার বেঁটে পা দুখানায় সাঁটা মাংসের একটা স্তূপ যেন একবার সামনে আর একবার পিছনে দুলছে, তার হাবা মুখখানা পড়ছে ঝুঁকে সামনের দিকে, মুখের দুই কোণ কুঁচকে গেছে—যে-হুকুম সে এইমাত্র শুনেছে, তাও উচ্চারণ করতে কষ্ট হচ্ছে তার। তারপর সাইরেনের মতো গর্জন করে উঠল—বারান্দায় শঙ্কার ছায়া ঘন হয়ে এল। কি ব্যাপার হলো খুব কম লোকই বুঝতে পারল। জানালা তখনও বন্ধ, দুজন বন্দী ওর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। এমনি ছিল তার সমস্যা সমাধানের রীতি।

হাঁ, এমনি লোকই সে। যাকে দেখত তাকেই মারত, এমন কি কখনো কখনো মেরেই ফেলত। হাঁ, এই-ই সে বুঝত, আর কিছু নয়। একদিন এক সেলে ঢুকে সেখানকার সবাইকে মারধর করল। একজন বন্দী তখন অসুস্থ, মাটিতে পড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল। আর সব বন্দীদের সে হুকুম দিল—পতিত বন্দীটির পা দাপানির সঙ্গে তাল রেখে ওঠ-বস করতে! কিছুক্ষণ পরেই বন্দী নিস্তেজ হয়ে পড়ল। পা দাপানি আর গোঁ গোঁ শব্দও থেমে গেল। এবার কোমরে হাত দিয়ে হাসতে লাগল স্মেতোনঝ যেন এমন একটা জটিল ব্যাপারের সুরাহা করতে পেরেছে বলেই তার আনন্দ।

খাঁটি আদিম মানুষ, তেমনি বর্বর। উপরওয়ালারা যা কিছু শেখাতে চেয়েছে তার মধ্যে একটা জিনিসই তার মনে আছে—প্রহারে বেশির ভাগ সমস্যার সমাধান হয়। এই সেই শিক্ষা।

শেষে দেখেছি এমনি ধারা জীবও ভেঙে পড়ল। মাস খানেক আগে একদিন সে আর 'কে'—জেল খানার অফিসে বসেছিল। 'কে'— তাকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে বোঝাচ্ছিল—বহুক্ষণ ধরে সে বোঝাচ্ছিল, বিরক্তি ধরে যাচ্ছিল, কিছুতেই স্মেতোনঝ বোঝে না। অবশেষে সেও যেন একটু বুঝতে পারল। এবার সে উঠে দাঁড়িয়ে অফিস ঘরের দরজা খুলে সন্তর্পণে তাকাল বারান্দার দিকে—দেখে নিল। নিস্তব্ধ জেলখানা, দুপুর রাতে ঘুমিয়ে আছে। দরজা বন্ধ করে চাবী দিল, তারপর যেন ভেঙে পড়ল চেয়ারেঃ

—তাহলে কি বলতে চাও ...?

হাতের উপর তার চিবুক। এক দুর্বিসহ বোঝা যেন চেপে বসেছে তার বিরাট দেহের আড়ালে, খুদে আত্মার উপর। বহুক্ষণ সে বসে রইল, তারপর মাথা তুলে বলল। স্বরে তার হতাশাঃ

—ঠিকই বলেছ। আমরা জিততে পারব না।

গতমাসে প্যানক্রাটস্ জেলখানায় তার রণোন্মত্ত চিৎকার আর শোনা যায়নি, নতুন বন্দীরা তার ঘুষির আস্বাদ পায়নি।

জেলের কর্তা

বেঁটে মানুষটি, সাব-প্লাটুনের অধিনায়ক ছিল। সব সময়েই, তা সে উর্দি পরুক আর না-ই পরুক, চমৎকার সেজে থাকত। সে নিজেকে নিয়েই ভারি খুশি। কুকুর, শিকার আর মেয়েও তার প্রিয়—তবে ওসব ব্যাপার নিয়ে আমাদের দরকার নেই।

তার চরিত্রের অন্যদিক অর্থাৎ প্যানক্রাটস-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়েই আমাদের আলোচনা। এখানে সে বর্বর, এতটুকু সংস্কৃতির ছাপ নেই তার ব্যবহারে। খাঁটি নাৎসী হঠাৎ-নবাব, নিজের চাকরি বজায় রাখবার জন্য সব কিছু করতে পারে। পোল্যান্ড থেকে আমদানী এই জীবটি। নাম সপ্‌পা—নামের কি মানে জানি না। ওরা বলে, ও এক কামারের কাজ শিখত, কিন্তু জীবিকা অর্জনের সেই সাধুপন্থা ওর উপরে কোনো ছাপই রাখতে পারেনি। বহুদিন আগেই ও হিটলারী দলে ঢুকেছিল, তারপর ছলচাতুরী আর তোষামোদের জোরে এই পদটি পেয়েছে। নিজের চাকুরি বজায় রাখতে হেন কাজ নেই যা ও করে না। বন্দীদের জন্য ওর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা বা অনুভূতি নেই, এমন কি নিজের লোক, ছেলেমেয়ে বা বয়স্কদের প্রতিও না। নাৎসী-বাদের প্রতি প্যান্‌ক্রাটস্-এর কোনও কর্মচারীরই এতটুকু শ্রদ্ধা নেই, কিন্তু তাই বলে সপ্‌পার মতো এমন মায়াদয়াহীনও বুঝি আর কেউ নেই। শুধু একজনকেই সে খানিকটা খাতির করে চলে, আলাপও করে। সে জেলখানার ডাক্তার, পুলিশ-মাস্টার ওয়েস্‌নার। কিন্তু সম্পর্কটা পারস্পরিক মোটেই নয়।

সপ্‌পা নিজেকে নিয়েই মত্ত। নিজের স্বার্থেই সে পদোন্নতি করেছে, নিজেরই খাতিরে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে বিশ্বস্ত হয়েই থাকবে। একমাত্র সে বুঝি মুক্তির উপায় অনেক ভেবেছে, কিন্তু সে জানে উপায় তো নেই। নাৎসীবাদের পতন তারই পতন নিয়ে আসবে। তার সমৃদ্ধ জীবন নিমেষে শেষ হয়ে যাবে, তার সুসজ্জিত গৃহ ও তার বিলাস সজ্জা মিলিয়ে যাবে। তার বিলাস-সজ্জার জন্য সে কি না করেছে, এমন কি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত চেকদের পোশাক এনে তার পোশাকের আবাস সাজিয়েছে।

হাঁ, নাৎসীবাদের পতন তারই পতন বটে।

জেল-ডাক্তার

পুলিস-মাস্টার ওয়েসনার—প্যানক্রাটস্-এর মঞ্চে এক অদ্ভুত জীব। মাঝে মাঝে তোমার মনে হবে, এখানে বুঝি সে বেমানান, কিন্তু ওকে ছাড়া তো প্যানক্রাটস্ সম্বন্ধে তুমি ভাবতেই পারবে না। যখন সে হাসপাতালে থাকে না, তখন তাকে দেখা যাবে প্যানক্রাটস্ জেলের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। পা যেন তার সব সময়েই টলছে, আর আপন মনে কি বলছে—তার চারপাশের সব কিছুর দিকেই রয়েছে তার সব সময়েই নজর। সে যেন এক বিদেশী, এখানে ঢুকে যতটা সম্ভব তথ্য যোগাড় করে নিয়ে যাবে। কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে তালার গায়ে চাবি লাগিয়ে যে কোন সেল খুলে চোখের পলকে পায়রার মতো নিঃশব্দে ঢুকে পড়তে পারে। শুকনো রসিকতায় ও পটু, তাই অনেক সময় এমন কথা বলে, যার মানে বোঝা যায় না, কিন্তু কোনও বেফাঁস কিছু বলে না যাতে তুমি তাকে অপদস্থ করতে পার। লোককে যে কোনও কিছু করাতে সে বাধ্য করতে পারে, কিন্তু ওকে দিয়ে কেউ কিছু করাতে পারে না। সে সবকিছু দেখে, কিন্তু গল্প করে না, অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে না। ধোঁয়াভরা কোনও সেলে ঢুকে সে গন্ধ শুঁকে বলেঃ

'হুঁ।' ঠোঁট কাটে 'এখানে ধূমপান হচ্ছে বুঝি'। আবার ঠোঁট কাটে আর বলেঃ 'ধূমপান একেবারে নিষিদ্ধ তা জানো।'

কিন্তু কারও বিরুদ্ধে নালিশ করে না। তার মুখে বলি রেখা পড়েছে, সব সময়েই সে উদ্বিগ্ন, যেন খুব কষ্ট পাচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা যায়, যে শাসন যন্ত্রের সে তাঁবেদার, যার শিকার আগলে সারাক্ষণ সে বসে আছে, তার সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। সে এ রাষ্ট্রের নীতিতে বিশ্বাসী নয়, স্থায়িত্বে বিশ্বাসী নয়, বিশ্বাসী হবে না। তাই তার পরিবার সে ব্রেসলাউ থেকে প্রাহায় আনেনি, অথচ রাইখের খুব কম অফিসারই অধিকৃত দেশে চেপে বসে এমন বিলাসিতার সুযোগ ছেড়েছে। কিন্তু যারা এই শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে তাদের সঙ্গে তার কোনও মিল নেই, সে উপায়ও নেই। সে কোনও দলেই ভেড়েনি।

আমার চিকিৎসা সে ভালো করেই করেছে—সেই তো তার কর্তব্য। আর আর রোগীর বেলাও তার ব্যতিক্রম হয় না। অত্যাচারিতদের যখন নতুন করে নির্যাতনের জন্য পেটচেক বিল্ডিংএ পাঠাবার হুকুম আসে, সে নিষেধ করে, বেশ জোর করেই বাধা দেয়। বিবেকের দংশন বুঝি এতেই শান্ত হয়। কখনও কখনও সাহায্যের খুব দরকার হলেও সে করে না। বোধ হয় ভয়েই করে না।

সাধারণ নাগরিকের সে প্রতীক। চাল্ শাসন ব্যবস্থার ভীতি আর তার পরিণাম—এই দ্বয়ের মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে সে সমস্যার সমাধানের জন্য তাকাচ্ছে, কিন্তু খ্ঁজে পাচ্ছে না। ধাড়ি ই'দ্র নয়, এক খ্দে ই'দ্র ফাঁদে ধরা পড়েছে।

আর উপায় নেই।

ফ্লিংক

অতি সাধারণ জীবনও নয়, আবার বিশিষ্টের পর্যায়েও পড়ে না, বরং দ্বয়ের মাঝামাঝি বলা যায়। ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবার মতো উপলব্ধি এখনও তার হয়নি।

এমনি দ্বজন এখানে আছে। সাধারণ মান্ষ, সব বোঝে, কিন্তু কাজ করবার মতো শক্তি নেই। তারা যে পরিবেশে এসে পড়েছে প্রথম তো তার ভয়েই অস্থির হয়ে উঠেছিল, তারপর জেগেছে ম্বক্তির কামনা। ওরা খ্ঁজে বেড়াচ্ছে, কেউ ওদের সমর্থন করবে কিনা এ ব্যাপার, স্বাবলম্বী ওরা নয়। দেখেশ্বনে ব্ঝতে ওরা পারে না। তোমাকে ওরা প্রতিদানের লোভে সাহায্য করবে। ওদের সাহায্য করা উচিত—হাঁ, এখন বর্তমান আর ভবিষ্যতে ওদের সাহায্য করা উচিত।

প্যানক্রাটস্-এর এরা দ্বজনই য্দ্ধ সীমান্ত ঘ্রে এসেছে।

হানাওয়ার দরজির কাজ করত ৎস্নোজমোতে। প্র্বসীমান্ত থেকে তুষারাহত হয়ে ফিরে এসেছে, শ্বনেছি নিজেই নাকি ব্যাপারটা ঘটিয়েছিল। 'য্দ্ধ আমাদের জন্য নয়,' সে সিওয়াইকের মতো দার্শনিক উক্তি করে, 'না, ওর কিছ্ই আমার ভালো লাগে না।'

হফার হলো বাটার কারখানার ম্চি, ফ্রান্সের অভিযানে সে ছিল, তারপর সামরিক কাজ ছেড়ে দিলে, অথচ তখন তার পদোন্নতির প্রতিশ্র্তি পেয়েছিল। —'যাক গে'—রোজ যেসব গোলমাল সৃষ্টি হোত তাকে সে হাত দিয়ে যেন এমনি করেই সরিয়ে দিত।

এদের অন্ভূতির মিল ছিল, অদৃষ্টও এদের একস্ত্রে বাঁধা। তবে হফারের ভয় কম, নিজেকে প্রকাশ করতে জানত, হানাওয়ারের চাইতে ব্যক্তিত্ব তার অনেক বেশি। প্রায় সব সেলেই ওকে ফ্লিংক বলেই ডাকে।

ও যখন পাহারা দেয়, সেলগ্বলি শান্ত থাকে। যা ইচ্ছা কর না ও তোমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠবে, কিন্তু চোখ টিপে জানিয়ে দেবে তোমাকে—সে শাসন করছে না, নিচের তলায় ইনস্পেক্টর আছে। তাকে সে জানিয়ে দিচ্ছে—কর্তব্য সম্বন্ধে সে কত সচেতন, কত কঠোর। কিন্তু

এমনি কড়া হুমকির চেষ্টা বৃথাই হয়। কাউকে সে বিশ্বাস করাতে পারে না, সে শাস্তি পায়নি এমন সপ্তাহ যায়নি।

'যাক গে—।' সে হাত দিয়ে সব যেন ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজের কাজ করে চলেছে। এখনও তেমনি চঞ্চলই আছে। আমাদের শিক্ষানবীশ মুচিটি, রক্ষী ওকে বলা যায় না। সেলের ছেলেদের সঙ্গে ওকে তুমি পয়সা দেয়ালে ছুঁড়ে খেলতে দেখতে পাবে, কি ফূর্তি তখন, আর খেলায় যেন মেতে আছে। পর মুহূর্তেই হয়ত বন্দীদের বারান্দায় সেল পরিদর্শনের জন্য এনে দাঁড় করাবে। যদি পরিদর্শনে দেরী হয় আর তোমারও কৌতূহল জাগে, উঁকি মেরে সেলের ভিতরে তাকিয়ে দেখবে—একটা টেবিলে দুহাতে মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কি আরামেই ঘুমোচ্ছে। উপরওয়ালার নজর থেকে জায়গাটা নিরাপদও বটে, কারণ বারান্দায় বন্দীরা নজর রাখছে, কেউ এলে সাবধান করে দেবে। তা ওর কাজের সময় ঘুমোনো দরকার বইকি, যে মেয়েটিকে পৃথিবীর সব কিছুর চাইতে সে বেশি ভালোবাসে সে ওর রাতের বিশ্রাম কেড়ে নিয়েছে।

নাৎসীবাদ বিজয়ী হবে না পরাজিত হবে? 'যাক গে—! তোমার কি মনে হয় এমনি ধারা জীবজন্তুর কাণ্ডকারখানা চিরদিন চলবে?'

সে নিজেকে এদের পর্যায়ে ফেলে না। তাইত ওকে ভালো লাগে। তাছাড়া ওদের দলে ভিড়তেও সে রাজি নয়। সে ওদের কেউ নয়। একখানা গোপন চিরকুট যদি অন্য বিভাগে কাউকে পাঠাতে চাও, ফ্লিংক সে ভার নেবে। বাইরে কাউকে খবর পাঠাতে হলে ফ্লিংক তোমাকে সাহায্য করবে। বহুলোকের জীবন বাঁচাবার জন্য কারো সঙ্গে যদি আলোচনার দরকার হয়, ফ্লিংক তোমাকে তার সেলে নিয়ে যাবে। পথের ছেলেদের মতোই পুলিসের উপর টেক্কা দিতে পারলেই ও খুশি। মাঝে মাঝে ওকে সাবধান হতে বলতে হয়, বোঝাতেও হয়। বিপদের অনুভূতিও ওর তেমন নেই। সে যে কাজ করছে তার সম্বন্ধে একেবারেই সে সচেতন নয়। সে কাজ করে স্বস্তি পায়, খুশি হয়, কিন্তু এতে তার মানসিক শক্তির বিকাশ হচ্ছে না, বাধা পাচ্ছে।

এখনও তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেনি, তবে গড়ার পথে চলেছে বটে।

কোলিন

সামরিক আইন জারি হয়েছে এমনি এক সন্ধ্যার কথা। এস্ এস্-এর উর্দি পরা রক্ষীটি আমাকে সেলে ফিরিয়ে দিয়ে গেল। লোকটা পকেট ভালো করে তালাস করেও দেখল না।

—হালচাল কি বল তো? ফিসফিসিয়ে সে বলল।

—জানি না। তবে এই খবর পেয়েছি, ওরা কাল আমাকে গুলী করবে।

—ভয় পাচ্ছ নাকি?

—না, তারই তো প্রতীক্ষা চলছে।

আমার কোটের উপর সে যন্ত্রচালিতের মতো হাত বুলিয়ে দিল।

—হয়তো তোমাকে মেরে ফেলবে। কাল আবার নাও তো হতে পারে, পরে হয়তো হবে; একেবারে নাও তো হতে পারে। তবে আজকালকার এই দিনে ... তৈরী থাকা ভালো ...

চুপ করে গেল সে।

—যদি ওরা মারেই, কারও কাছে খবর দিতে হবে?...কিছু লিখতে চাও? এখন ছাপা হবে না, তাতো জানোই, তবে ভবিষ্যতের জন্য লিখে যেতে পার। কি করে এখানে এলে, কে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, কে কেমন ব্যবহার করেছে—এই সব। তাহলে এতদিন ধরে যা জানলে তোমার সঙ্গে সঙ্গেই তাতো নষ্ট হয়ে যাবে না?

লিখতে চাই কিনা? ওকথা আবার জিজ্ঞাসা করছে? তাই কি আমার একান্ত কামনা নয়!

সাবধানে এক নিমেষে সে নিয়ে এল কাগজ আর পেন্সিল, আমি এমন করে সেগুলো লুকিয়ে রাখলাম, শত তালাস করেও তার পাত্তা মিলবে না।

কিন্তু বহুদিন কাগজ পেন্সিল ছুঁতে পারিনি।

সত্যি বলে বিশ্বাসই হোত না। এই অন্ধকার পুরীতে এ কি অবাক কান্ড ঘটে গেল। যারা শুধু চিৎকার আর মারধর করে উর্দিপরা সেই সব জীবদের ভিতরে এমনি একজন সত্যিকারের মানুষ পাব ভাবতে পারিনি। পেলাম বই কি, বন্ধুই পেলাম যে আমাকে সাহায্য করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল, যারা এই নির্যাতন আর ভীতির রাজত্বের পরও বেঁচে থাকবে, ক্ষণিকের জন্য তাদের সঙ্গে কথা বলার পথ সুগম করে দিল—যারা বাঁচবে না তাদের সঙ্গেও তো কথা বলার সুবিধে পেলাম। আর তাকে পেলাম এমনি মুহূর্তে যখন ওরা বধ্যভূমির শীকারদের নাম ডাকছে—চেঁচিয়ে, চারদিকে যখন রক্তলোলুপ জীবে ভরে গেছে, যখন ভীতি গলার স্বর রুদ্ধ করে দিয়েছে, ইচ্ছে করলেও যখন চেঁচিয়ে উঠবার উপায় নেই। হাঁ, এই সময়ে এই বন্ধু-ভাগ্য—এতো বিশ্বাস করা যায় না!. সত্যি তো? যদিও সত্যও না হয়, অন্তত সতর্ক করে তো দিলে। কিন্তু আমার এই অবস্থায় বন্ধুর মতো যে হাত বাড়িয়ে দিল সাহায্য করতে তার কতখানি মনের জোর, তাই-ই ভাবছি! হাঁ, কতখানি তার সাহস!

এক মাস কেটে গেল। সামরিক আইন তখন রদ করা হয়ে গেছে। থেমে গেছে চিৎকার, সেই নিষ্ঠুরতম মুহূর্ত তো এখন শুধু স্মৃতি। সেদিন

সন্ধ্যায় আবার নির্যাতন সহ্য করে সেলে ফিরে এলাম। সেই একই রক্ষী আমার সঙ্গে।

—যাক টিকে গেছ। সব ঠিক আছে তো কমরেড? ওকে খুবই উদ্বিগ্ন দেখলাম।

সে কি বলতে চায় বুঝতে পারলাম। তার প্রশ্নে মনে দোলা লেগেছে। তার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে আর তো সন্দেহ নেই। যার নৈতিক দাবি আছে, সেই তো ও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে। সেই মুহূর্ত থেকে বিশ্বাস করলাম, সে এখন আমাদেরই একজন।

প্রথম দেখলে তাকে অদ্ভুতই লাগত। একা বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে,—শান্ত, মুখচোরা লোকটি, কিন্তু ভারী সজাগ।

'দোহাই, স্মেতোনঝ এদিকে তাকালে আমাদের দু-এক ঘা মেরো।' আমার অন্যান্য সেলের পড়শীরা ওকে ওর নিজেরই ভালোর জন্য একটু তম্বি করতে বলতেন।

'না, তার দরকার নেই', সে মাথা নেড়ে বলত। তাকে চেক ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলতে শোনা যায়নি। তার চাল-চলন ভাব-ভঙ্গী দেখে মনে হোত, সে আর সবার চাইতে একেবারে আলাদা, কিন্তু কেন আলাদা সেইটে বোঝাই তো শক্ত। আর সবাইও তো অনুভব করে, কিন্তু তাদের বিচার বুদ্ধি জাগিয়ে তোলা তো যায়নি।

যেখানে প্রয়োজন সেইখানেই ছুটে যাবার মতো শক্তি ওর আছে। যেখানে বুদ্ধিভ্রংশতা দেখা দেয়, সেখানে সে শান্তি নিয়ে আসে। যখন আমাদের যোগসূত্র ধ্বংস হয়ে যায়, বাইরে বহু লোকের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে, সে তখন যারা বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে এমন লোকদের সঙ্গে নতুন করে আবার যোগাযোগ করে দেয়। সব ব্যাপার খুঁটিয়ে সে দেখে না, কিন্তু সুষ্ঠুভাবে কাজ করে যায়; তার ব্যাপকতাও আছে বই কি।

ব্যাপারটা নতুন নয়! আমাদের লোক যখন নাৎসীদের চাকরিতে ঢুকেছিল, এমনি ভাবে কাজ করবে বলেই গিয়েছিল।

যে চেক রক্ষীটির কথা বলছি, তার নাম অ্যাডলফ কোলিনস্কী। মোরাভিয়ার এক পুরনো বংশের ছেলে সে, জার্মান বলে জাত ভাঁড়িয়ে সে চেক বন্দীদের পাহারা দেবার ভার পেয়েছে। প্রথম হ্রাদেক ক্রালোভে কাজ করত, এখন এসেছে প্যানক্রাটস্। ওর পরিচিত ভাই-বেরাদাররা ওকে দেখতে পারত না। চার বছর পরে জেলের জার্মান সুপারিনটেণ্ডেণ্ট একদিন ওর মুখের উপর ঘুষি তুলে ওকে শাসায়ঃ

—তোমার চেকত্ব একটি ঘুষিতে ঘুচিয়ে দেবো!

একটু বেশি দেরি হয়ে গেল! আর সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ভুলই করেছিল। শুধু কোলিনস্কীর চেকত্ব ঘোচালেই তো হোত না, তার মনুষ্যত্বও পিষে মেরে ফেলতে হোত। হাঁ, কোলিনস্কী সেই লোক যে সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে, স্বেচ্ছায় শত্রুর দলে ভিড়েছে—সেখানে তাদের সঙ্গে লড়াই করবে বলে, এবং অন্যকে যুদ্ধে সাহায্য করাও তার আর এক কাজ। প্রতি মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা তাকে শক্তিমান করে তুলেছে, সে কাজ করে চলেছে।

আর আমাদের কথা

১৯৪৩ সালের এগারই ফেব্রুয়ারী। ওরা যদি সেদিন কালো পাচনের বদলে প্রাতরাশের সময় কোকো এনে হাজির করত আমরা বোধ হয় তেমন আশ্চর্য ব্যাপারও লক্ষ্য করতাম কিনা সন্দেহ। কারণ, সেদিন সকাল বেলায় আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। আমাদের সেলের আশে পাশে চেক পুলিসের উর্দি দেখতে পেলাম।

হাঁ, ঘুরে বেড়াচ্ছে বইকি। আমরা শুধু কালো ট্রাউজার আর উঁচু বুট দেখতে পেলাম। এক পা এগিয়ে এল কালো ট্রাউজার পরা উঁচু বুটওয়ালা পা, ঘন নীল আস্তিনের ভিতর থেকে একখানা হাত তালার কাছে এগিয়ে এল, তালা খুলে তারপর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গেল মিলিয়ে। এত তাড়াতাড়ি ঘটল ব্যাপারটা যে পাঁচ মিনিট পরে আমাদের নিজেদেরই বিশ্বাস হলো না ব্যাপারটা।

প্যানক্রাটস্-এ চেক পুলিস। এর থেকে কি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছোন যায়, কত পল্লবিত করে বলা যায় এ কাহিনী?

দু-ঘণ্টা বসে তাই-ই করলাম। আবার খুলে গেল সেলের দরজা, আবার চেক পুলিসের টুপী উঁকি মারছে, ঠোঁট নড়ছেঃ আমাদের অবাক হতে দেখে হাসছে।

—ভিতরে যাও!

না, আর ভুল হবার যো নেই। নীল-ধূসর এস্-এস্ রক্ষীর উর্দির বদলে বারান্দায় আজ দেখা দিয়েছে কয়েকটি ঘন কালো উর্দির সমারোহ—ওরা চেক পুলিস কর্মচারী, আমাদের চোখে অনেক বেশি সুন্দর আর উজ্জ্বল।

এর মানে কি? ওরা কেমন হবে কে জানে? তবে এখন ওরা এখানে এসে হাজির হয়েছে, কথা বলছে। শাসন ব্যবস্থা বুঝি আসন্ন মৃত্যুর সময়েই তার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে যে জাতিকে ওরা পীড়ন করতে চায়, সে জাতির লোক এনে ভরতি করে। তারা জানে, এমনি করে শাসন ব্যবস্থাকে

টিকিয়ে রাখা যায়। সীমান্তে না জানি কত লোক-শক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে, তাই বুঝি পুলিস বিভাগ থেকে চলেছে সৈন্য সংগ্রহ। এমনি ধারা শাসন ব্যবস্থা কত দিন টিকবে?

অবশ্য ওরা এখানে বাছাই করা লোকই পাঠাবে, হয়তো তারা জার্মান রক্ষীদের চাইতে খারাপই হবে। কেননা এখন তো তাদের সেই সতর্কতা নেই। তারা বিজয়ের আশা আর করে না। কিন্তু এস্-এস্ রক্ষীর বদলে চেক পুলিস নিয়ে আসায় পতন আসন্ন হয়ে এসেছে—এই প্রত্যক্ষ প্রমাণটুকু তো পাওয়া গেল।

এমনি ধারা তর্ক-বিতর্ক করলাম আমরা।

আর সংখ্যায় তারা বেশ বেশি, আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। তার মানে, শাসন যন্ত্রের আর বাছ-বিচার করবার শক্তি নেই, শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখবার জন্য যে লোকের দরকার তা আর নেই।

এগারই ফেব্রুয়ারী প্যানক্রাটস্-এ প্রথম দেখলাম চেক উর্দি।

পরদিন থেকে উর্দিধারীদের সঙ্গে পরিচয় শুরু হোল। এক জন এসে হয়তো সেলের ভিতর উঁকি মারে, দরজায় পা ঘসে, তারপর হঠাৎ সাহস করে আমাদের চোখের দিকে তাকায়, যেন খুদে খোকাটি, হঠাৎ লাফিয়ে উঠলঃ

—ভদ্দর লোকেরা কেমন আছ গো?

আমরা হেসে উত্তর দিই, সেও হাসে। তারপর হঠাৎ বলে যায়ঃ

—আমাদের উপর রাগ করো না। বিশ্বাস কর, তোমাদের পাহারা দেওয়ার চাইতে বাইরে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো ভালো। তবু কাজ নিতে হয়েছে, হয়তো—হয়তো এতে ভালোও হতে পারে...

আমরা প্যানক্রাটস্-এ ওদের আসার মানে আর ওদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণার কথা বলতেই সে খুশি হলো। এক মুহূর্তে বন্ধুত্ব হলে গেল। ওর নাম ভাইটেক, সরল ছেলে, মনটা ভালো। ও-ই প্রথম দিন ভোরবেলা আমাদের সেলের দরজার কাছে ঘুর ঘুর করছিল।

দ্বিতীয়টি টুমা, একেবারে পুরানো চেক পুলিসের খাঁটি স্টাফ। একটু কর্কশ, হৈ চৈ করে কিন্তু মনটা ভালোঃ ওদের আমরা রিপাব্লিকের সময় 'পপ' বলে ডাকতাম। এখনও ওর ভাবসাব কিছু বদলায়নি। বরং এখানে ভালই লাগছে। শান্তি আর শৃংখলা রক্ষা করছে, আবার খেয়াল খুশিতে ভাঙছেও বটে। মাঝে মাঝে স্থূল রসিকতা করাই তার অভ্যাস। ও সেলে রুটি আর সিগারেটও যোগায়, যা কিছু নিয়ে যে কারো সঙ্গে বসে গল্প করে; তবে রাজনীতির কাছেও ঘেঁসে না। এসব বেশ সহজ ভাবেই করে। চৌকিদারী সম্বন্ধে এই ওর ধারণা—একথা লুকোবার চেষ্টা করে না। সে পয়লাবার গালাগাল খাবার পর একটু সাবধান হয়েছে, কিন্তু বদলায়নি।

এখনও সে সেই পুরানো আমলের বুড়ো পুলিস। ওর কাছ থেকে এর চাইতে বেশী কিছু প্রত্যাশা কোরো না, তবে ওর পাহারার সময় সহজে নিশ্বাস ফেলতে পারবে।

তৃতীয় চেক পুলিসটি বারান্দায় শুধু পায়চারি করে বেড়ায়। মুখে তার ভ্রূকুটি, কথা সে বলে না, কিছু দেখেও না। ওর সঙ্গে পরিচয় করতে আমরা উদগ্রীব, ওর কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

—ওকে যখন ঢোকায় তখন বোধ হয় আর লোকই ছিল না দেশে। এক সপ্তাহ ওকে দেখার পর 'বাবা' মন্তব্য করলঃ ওদের মধ্যে সব চাইতে অপদার্থ এইটি।

—আবার সব চাইতে চতুরও হতে পারে। তর্কের খাতিরে বলে উঠলাম। সামান্য ব্যাপার নিয়ে এমনি বিরোধী কথা সেল-জীবনকে একটু সরস করে তোলে।

দু-সপ্তাহ পরে একদিন মনে হোল, এই চুপচাপ লোকটি যেন চোখ টিপল একবার। এতো তার কাজের এলাকার বাইরে! আমিও একই সঙ্কেত করলাম, জেলখানায় তার হাজারো মানে হতে পারে বই কি। কিন্তু কিছুই তো হলো না। হয়তো ভুলই করেছিলাম।

একমাস পরে, সব পরিস্কার হয়ে গেল। হঠাৎ যেন সবটা প্রজাপতির মতো গুটি থেকে বেরিয়ে এল। হাঁ, এই মুখহীন গুটিটি ফেটে চৌচির হয়ে গেল, বেরিয়ে এল এক জীবন্ত জীব। প্রজাপতি নয়, মানুষ।

কয়েকটা চরিত্র-চিত্র পড়ে 'বাবা' একদিন বলল, এ তো চিত্র নয়, তুমি স্তম্ভ গড়ছ।

হাঁ, স্তম্ভই আমি গড়তে চাই, যারা সত্যি সত্যি সাহস নিয়ে এখানে আর বাইরে লড়াই করে যাচ্ছে, যারা প্রাণ দিচ্ছে, সেই সাথীদের স্মৃতি আমি জিইয়ে রাখতে চাই। আর যারা জটিল পরিবেশের ভিতরে আমাদের সাহায্য করছে তাদেরও চাই আমি জীবন্ত করে রাখতে। তাদের সাহস আর বিশ্বাস তো আমার সাথীদের চাইতে কম নয়। প্যানক্রাটস্-এর প্রেতায়িত বারান্দা থেকে কোলিনস্কী আর এই চেক পুলিসটিকে আমি জীবনের আলোতে নিয়ে আসতে চাই। না, তাদের মহিমার জন্য নয়, তারা হবে আর সবার কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। মানুষের কর্তব্য তো এই যুদ্ধেই শেষ হয়ে যাবে না, মানুষ যতদিন না সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠে, ততদিন মানুষ হতে হলে বীরত্বের প্রয়োজন তো হবেই। আর এরা হবে তারই দৃষ্টান্ত।

জারোস্লাভ হোরার কাহিনী অতি ছোট। কিন্তু এরই ভিতরে একটা গোটা মানুষের জীবন দেখা যাবে।

র‍্যাডনিকো একেবারে দেশের এক কোণে, চমৎকার জায়গা—কিন্তু যেমনি জনবিরল তেমনি গরীব অঞ্চল। তার বাবা কাচের জিনিস তৈরী করত। দুঃখের জীবন ছিল তার। যখন কাজ থাকত তখন হাড়ভাঙা মেহনৎ করত, আর যখন দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়ে যেত তখন ভোগ করত দারিদ্র্য। এতে হয় মানুষকে নুইয়ে ফেলে, নয় তো তাকে মাথা তুলতে শেখায়, নতুন পৃথিবীর সে স্বপ্ন দেখে। তার বাবা নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখল, শিখল তারই জন্য লড়াই করতে। সে হোল কমিউনিস্ট।

জারদা তখন কিশোর, সেও সেদিনের মিছিলে সাইকেল বাহিনীতে যোগ দিত, লাল ফিতে বাঁধা থাকত তার সাইকেলের চাকায়। তার সাইকেলের লাল ফিতে সেখানেই বাঁধা থাকত না—যখন স্কোডার কারখানায় লেদ বিভাগে কাজ করতে যেত সঙ্গে সঙ্গে থাকত সেই ফিতে।

তারপর দেশে এল বেকার সমস্যা—শুধু সমস্যা নয় সংকট; সে চাকরি নিল সৈন্যবিভাগে, তারপর পুলিসে। তার লাল ফিতেটি কি হোল জানি না—হয়তো গুটিয়ে কোথাও রেখে দিয়েছিল, হয়ত একরকম ভুলেই গিয়েছিলো তার কথা—কিন্তু একেবারে হারায়নি। একদিন ওরা ওকে প্যানক্রাটস্-এ বদলি করল। কোলিনস্কীর মতো আগে থেকে ঠিক করে সে স্বেচ্ছায় আসেনি। কিন্তু সেলের ভিতরে প্রথম দিন উঁকি মেরেই সে সজাগ হোলঃ হাঁ, তার কাজ আছে বই কি। গুটানো ফিতে তখন খুলতে শুরু করেছে।

প্রথমে সে কর্মক্ষেত্র পরিদর্শন করে দেখলে। তার নিজের শক্তি সম্বন্ধেও সে তখন সচেতন। তার মুখে ভ্রূকুটি, মনে গভীর চিন্তা, কোথায় কি ভাবে শুরু করতে হবে। সে তো পেশাদার রাজনীতিজ্ঞ নয়, সামান্য মজুরের ছেলে। কিন্তু তার বাবার অভিজ্ঞতা সে উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছে। তার চরিত্র দৃঢ়, তাই সে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছল। যখন সে স্থির করে ফেলল কি করবে, ভ্রূকুটি ভরা খোলস থেকে বেরিয়ে এল মানুষটি।

ভিতরে সে খুবই চমৎকার, স্পর্শাতুর, লাজুক কিন্তু পুরুষত্ব আছে। প্রয়োজন অনুসারে সে দুঃসাহসিকও হতে পারে। ছোট বড় সব কাজই সে করে। নিঃশব্দে কাজ করে যায়, এমন কি ভাবে ভঙ্গীতেও কিছু প্রকাশ করে না, কিন্তু সে জানে, কি সে করেছে, ভয়ও তার নেই। সব কিছু যেন ওর কাছে সহজ, এ যেন ওর মনেরই আদেশঃ এই কাজটি করতে হবে, এ সম্বন্ধে বলে তো লাভ নেই।

এই-ই শেষ। যে মানুষটি ক'টি জীবন বাঁচাবার কৃতিত্ব দাবি করতে পারে তারই সম্পূর্ণ কাহিনী। তারা এখনও বেঁচে আছে, বাইরে কাজ করছে, কিন্তু প্যানক্রাটস্-এ একটি মানুষ মানুষের মতো কাজ করেছিল বলেই তো তা সম্ভব হয়েছে। তাদের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই,

তারাও তাকে চেনে না। তারা কোলিনস্কীকেও চেনে না, তবে আশা করি পরে পরিচয় হবেই। দুজন কর্মীর পরস্পরের পরিচয়ে দেরি হয় না।

এদের মনে রেখো। এই দুজন লোক—তাদের মাথাটা তারা নিজেদের কাছে রেখেছে, মন তাদের ঠিক জায়গায় পড়ে আছে—তারা মাথা আর মন—দুয়েরই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে।

বাবা স্কোরেপা

দৈবক্রমে যদি ওদের তিনজনকে কখনও একসঙ্গে দেখতে পাও তো ভ্রাতৃত্বের এক জীবন্ত ছবিই তুমি পাবে—ধূসর-নীল এস্-এস্ উর্দি পরা কোলিনস্কী, চেক পুলিসের ঘন নীল উর্দি পরা হোরা আর জেলখানার হালকা রংয়ের বাজে উর্দি পরা বাবা স্কোরেপা—ওদের একসঙ্গে খুব কমই দেখতে পাবে—হাঁ, খুবই কম। কেননা কাজ ওদের একই রকমের।

জেলের আইন-কানুন অনুসারে বিশ্বাসী, সুশৃঙ্খল কয়েদীদের দিয়েই বারান্দা ঝাটপাট বা খাবার দেয়ানো হয়। এই কয়েদীদের অন্য সবার থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবেই রাখা হয়। এই হচ্ছে আইনের ধারা, মৃত ধারাই একে বলতে হবে, একেবারে মৃত। জেলখানার আইনমাফিক এমন তত্ত্বধায়ক নেই, কখনও ছিলও না। গেস্টাপোজেলখানায় তো নয়ই। এখানকার তত্ত্বাবধায়কেরা তো এক একটি আরশুলার শুঁড়ের মতো—স্পর্শেন্দ্রিয় বিশেষ। এই জেল-খানার সংঘশক্তির স্রষ্টা তারা, বাইরের জগতের সঙ্গে সেলের যোগাযোগ স্থাপনই তাদের কাজ। সংবাদ ধরা পড়ায় কত তত্ত্বাবধায়ককে প্রাণ দিতে হয়েছে, তারা কতজন গুপ্ত লিপি শুদ্ধ ধরা পড়েছে। কিন্তু জেলখানার সংঘশক্তি তবু নিষ্ঠুর দাবি জানিয়েছে তাদের উত্তরাধিকারীদের কাছে, তাদেরও এই বিপদের পথে চলতে হবে, সাহস করে বা ভয়ে যে কারণেই হোক না তাদের সংঘের কাজ করতেই হবে। এখানে আর একটু বেশী বিপদ আছে, আজ কি কাল তোমাকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। গোপন আন্দোলনে এতো থাকবেই।

এ হলো গোপন আন্দোলনের সব চাইতে সেরা কর্মক্ষেত্র, এখানে যারা বিরোধী শক্তিকে পিষে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে তাদেরই চোখের সামনে কাজ করতে হবে। রক্ষীদের দৃষ্টির সম্মুখে, তোমার নির্দিষ্ট কাজের ফাঁকে ফাঁকে, এই কঠোর পরিবেশের মধ্যে কাজ করে যেতে হবে। বাইরে গোপন আন্দোলনের সম্বন্ধে যে শিক্ষা পেয়েছ এইখানে তা অচল, কিন্তু কাজ এখানে সমানই, বরং বেশীও বলতে পার।

গোপন আন্দোলনের কুশলী কর্মী বাইরে যেমন, তেমনি এই তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যেও আছেন। বাবা স্কোরেপা তো সেদিক থেকে ওস্তাদ—ভারি নিরীহ, মুখখানা দেখলে বোঝাই যায় না, কিন্তু কাজে কর্মতৎপর। রক্ষীরা ওকে প্রশংসা করে বলে—দেখ, দেখ, কি কাজেই না ওর উপরে নির্ভর করা যায় ,নিজের কাজ চমৎকার বোঝে, আইন কানুনের বাইরে সে একচুলও যাবে না। অন্য তত্ত্বাবধায়কদের ডেকে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলে।

হাঁ, আমরাও বলি, হে তত্ত্বাবধায়ক দল, ওকে অনুকরণ কর। এমন চমৎকার তত্ত্বাবধায়ক মেলে না, বন্দী যেমনটি চায় ঠিক তেমনটি। জেল-পঞ্চায়েতের শক্তির মধ্যে সব চাইতে শক্তিমান আর অনুভূতিপ্রবণ সে।

কোন সেলে কে আছে, কে নতুন এল, কেন সে এসেছে, কাদের কাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে, বাইরে তার কি কাজ ছিল, তার সঙ্গীরাই বা কারা—সব খবরই সে জানে। সে প্রতিটি 'মামলা' সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তাদের ভিতরের তথ্য জানতে সচেষ্ট। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হলে বা সুপরামর্শ দিতে হলে এগুলো দরকার।

শত্রুকেও সে চেনে। প্রতি রক্ষীটি সম্বন্ধে সে সজাগ, তার অভ্যেস, তার দুর্বলতা আর শক্তির কথা সে জানে। তার কাছে কতটুকু প্রত্যাশা করা যায়, কতটুকু বা তাকে কাজে লাগানো যায়, কি করে তাকে ঠকানো বা ধাপ্পা দেওয়া যায় সবই তার মুখস্থ। রক্ষীদের বিশেষত্বের যে সব কথা আমি লিখেছি, তার প্রায় সবগুলিই বাবা স্কোরেপার বলা। সে সবাইকে চেনে, সবার খাঁটি পরিচয় দিতে পারে। সে বারান্দায় ঘুরে বেড়িয়ে নিজের কাজটুকু বেশ ভাল ভাবেই উদ্ধার করে নিতে জানে। তার পক্ষে এসব জানা দরকার বই কি।

মোটকথা হচ্ছে, স্কোরেপা তার কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ। সে কমিউনিস্ট; প্রতিমুহূর্তে কমিউনিস্ট হিসেবেই তাকে কাজ করে যেতে হবে। একথা সে জানে। কাজের সময় বয়ে যাবে আর সে হাত কোলের উপর রেখে চুপ করে বসে থাকবে এমন ফুরসৎ তার নেই। এই তার উপযুক্ত জায়গা সে খুঁজে নিয়েছে এই বিপদের মাঝখানে, কাজের চাপ তার উপর যথেষ্ট। এখানে এসে তার মানসিক বিকাশও হয়েছে।

স্থান কাল পাত্র বুঝে সে কাজ করতে জানে। প্রতি দিন, প্রতি ঘণ্টায় নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, তারই জন্য চাই নতুন কার্যপদ্ধতি। সে খুব তাড়াতাড়ি পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারে, হয়তো এক ভগ্নাংশ মুহূর্ত সময় তখন আছে। সেলের দোরে ঘা দেবার পক্ষে সেই তো যথেষ্ট, ফোকর দিয়ে শুনল খবর, তারপর বারান্দায় আর একপ্রান্তে এক সেলে ঠিক ঠিক সেই খবর দিয়ে এল। সময়ও তো নেই। রক্ষী নিচে চলে যাবে, বদলি

উপরে উঠে আসবে—তারই মধ্যে কাজটা শেষ করতে হোলো। ভারি সাবধানী সে উপস্থিতবুদ্ধিও তার খুব। জেলখানা থেকে কত গুপ্ত খবর ওর হাত দিয়ে গেছে, কিন্তু একটাও ধরা পড়েনি, কারও সন্দেহও হয়নি।

কে বিপদে পড়ল, কাকে বাইরের পরিস্থিতির কথা বলে চাঙ্গা করে তুলতে হবে ও যেন জানতে পারে—এ বুঝি তার সহজাত প্রবৃত্তি। বাবার মতো বাৎসল্যের দৃষ্টি ওর চোখে, সে-দৃষ্টি দিয়ে কাকে উৎসাহিত করতে হবে, কাকে হতাশার বিরুদ্ধে লড়তে সাহস জোগাতে হবে—তা ও জানে। পরবর্তী অনশনের পর্যায়ে টিকে থাকবার জন্য কে একটুকরো রুটি বা একহাতা ঝোল খেয়ে তাকদ বাড়াতে চায় তাও ওর অজানা নয়।

নিজের অভিজ্ঞতা আর অনুভূতিই তাকে এসব শিখিয়েছে—তাই কোথায় কি করা দরকার তাকে বলে দিতে হয় না।

হাঁ—এই আমাদের 'বাবা' স্কোরেপা। সাহসী, শক্তিমান, নির্ভীক সৈনিক। একজন খাঁটি মানুষ।

যারা একদিন আমার এই লেখা পড়বে, আমার অনুরোধ, তারা যেন ওকে একজন মানুষ বলেই মনে করে না, ও তত্ত্বাবধায়কদের সবার সেরা। অত্যাচারী শাসক যে কাজের দাবি জানিয়েছিল ওর কাছে, ও সেই কাজকেই অত্যাচারিতের সেবায় লাগিয়েছে। এখানে একজন 'বাবা' স্কোরেপাকেই দেখছ, কিন্তু এমনি বহুলোক আছে, তারাও কাজ করে যাচ্ছে—তার থেকে তারা কম তো নয়। সবার ছবিই আমি আঁকতে চেয়েছিলাম—অন্তত প্যানক্রাটস্ কয়েদখানা আর পেটচেক বিল্ডিং-এ যারা আছে তাদের তো বটেই—কিন্তু আর ক'ঘণ্টা সময় আছে!—'যে গান দ্রুত গাওয়া হোল, যে গান থাকবে বেঁচে—সে গানের পক্ষে সময় যে ভারি কম।'

তাই, আর কটা নাম উল্লেখ করবার সময় মাত্র আছে, বহুর ভেতর থেকে কটি মাত্র উদাহরণ—তারা স্মরণীয় তো বটেই:

'রেনেক'—জোসেফ টেরিঙ্গল কঠোর বটে, কিন্তু উত্তেজনাপ্রবণ, জীবনকে সে আহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত—পেটচেক বিল্ডিং-এর ইতিহাসের আর আমাদের সেখানকার সংগ্রামের সঙ্গে তার স্মৃতি জড়িত। তার অভিন্ন সহৃদয় সাথী জো বারভিডু-ও তারই মতো আর একজন।

ডাক্তার মাইলোস নেডভেড, সুশ্রী ভদ্র তরুণ—আমাদের বন্দী কমরেডদের দিনের পর দিন সাহায্য করবার জন্যই ওস্ওইসিমে প্রাণ দিল।

আর্নস্ট লোরেনৎস্, তার সঙ্গীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি বলেই তার স্ত্রীর প্রাণদণ্ড হোল। বন্ধুদের বাঁচাতে গিয়ে সে একবছর পরে প্রাণ দিল।

ভাসেক রেজকু। তার ছিল অদ্ভুত রসিকতাবোধ—কখনও তা লুপ্ত হয়নি।

অ্যানি ভিকোভা—চাপা মেয়ে, বিশ্বাসী মেয়ে—সামরিক আইনের অধ্যায়ে তার প্রাণদণ্ড হোল।

স্প্রিঙ্গার, সেই সুচতুর, সদাহাস্যময় 'গ্রন্থাগারিক', যে সব সময়েই নতুন নতুন উপায়ে নিজের কাজ করে যেত।

বিলেক, সেই সুকুমার তরুণ...

এই তো কতগুলি উদাহরণ, নমুনা। ব্যক্তিত্ব এদের ছিল, ছোট বড় যাই-হোক না কেন,—এরা জীবন্ত, শুধু কতকগুলো লোক এরা নয়।

আট

একটু ইতিহাস

৯ই জুন, ১৯৪৩ সাল

আমার সেলের সুমুখে একটা কোমরবন্ধ ঝুলছে। আমারই কোমরবন্ধ। অদূর ভবিষ্যতে চালান দেবার নির্দেশ। একদিন রাতে কোনও এক সময়ে ওরা আমাকে বিচারের জন্য রাইখে নিয়ে যাবে—তারপর যা হবার হবে। আমার জীবন যেন এখন রুটির শেষ টুকরো—সময় তার শেষ গ্রাস কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে। চারশো এগারো দিন প্যানক্রাটস্-এ খুব তাড়াতাড়িই কেটে গেল। অদ্ভুত লাগে। আর ক'দিন আছে? কেমন সে দিনগুলি? কোথায় কাটাব সেই ক'দিন?

আর কোথাও গিয়ে তো লেখার সুযোগ হবে না। তাই এই আমার শেষ স্বাক্ষর। একটু ইতিহাস—আর সে-ইতিহাসের বোধ হয় শেষ জীবন্ত সাক্ষী আমি। হাঁ, তাইতো মনে হয়।

১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ওরা চেক কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় পরিষদের সবাইকে গ্রেফ্তার করল—এমন কি যে দ্বিতীয় দলের নেতাদের উপর আমাদের মৃত্যুর পরে কাজের ভার ছিল তারাও বাদ গেল না। কি করে যে এমন কঠোর আঘাত হঠাৎ এসে পড়ল আমাদের উপর, আজও সে কথা পরিষ্কার বোঝা যায় নি। যেদিন গেস্টাপো কমিসারদের ধরে তাদের স্বীকারোক্তি নেওয়া হবে সেদিন হয়তো সেকথা পরিষ্কার হয়ে যাবে। পেটচেক বিল্ডিং-এ তত্ত্বাবধায়ক হয়ে সে রহস্য আমি বৃথাই জানতে চেয়েছিলাম। নিশ্চয়ই গোয়েন্দা ঢুকেছিল দলে আর ছিল অসাবধানতা। দুবছর ধরে সফল গোপন আন্দোলন চালাবার পর আমাদের কমরেডদের সতর্কতা কেমন শিথিল হয়ে পড়েছিল। আমাদের গুপ্ত সমিতি তখন ছড়িয়ে পড়েছে; প্রতিদিনই নতুন কর্মী আসছে—এমন কি প্রথম দলের কিছু ঘটলে দ্বিতীয় দলের ভার যারা নেবে তারাও তখন নতুন। আমাদের সেলের জালও তখন বিস্তৃত, জটিলতা দেখা দিয়েছে, তার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ তখন অসম্ভব। কেন্দ্রীয় সংগঠনের উপর এই আঘাত হানবার জন্য ওরা বহু আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল, তারপর শত্রু যখন সোভিয়েট আক্রমণের জন্য প্রস্তুত তখনই এল আঘাত।

প্রথম ক'জনকে ধরল আগে জানতে পারিনি। আগের পরিকল্পনা অনুসারে তখনও আমি প্রতীক্ষায় ছিলাম, যারা বাকি আছে তারা নিশ্চয়ই যোগাযোগ রাখবে। কিন্তু নিষ্ফল প্রতীক্ষা। মাসখানেক পরে স্পষ্ট বোঝা গেল ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে। আর শুধু বাইরের যোগাযোগের অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না। তাই ভিতরের যোগসূত্র খুঁজতে লাগলাম, অন্য সবাইও আমার পন্থাই ধরল।

প্রথম যাকে পেলাম সে হোনৎসা ভিসকোচিল, মধ্য বোহেমিয়া বিভাগের প্রধান। যথেষ্ট তৎপরতা আছে, 'রেড রাইটস্' প্রকাশ করবার জন্য কিছু লেখাও যোগাড় করে ফেলেছে, খবরের কাগজের অভাব যাতে পার্টির না হয় সেই ব্যবস্থাই করেছে। আমি প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখলাম, তার পর দুজনে আলোচনা করে ঠিক করলাম যে, এইসব লেখা 'রেড রাইটস্'-এর বদলে 'মে পত্রিকা' বলে বার করা যাক। আগেকার মতো কাগজের নিয়মিত সংখ্যা বার না করে অন্যান্য দলগুলোও এমনি কাগজ বার করতে শুরু করল।

পরের মাস কেটে গেল দলের কাজে। আঘাত যত প্রচণ্ডই হোক পার্টিকে তো সে ধ্বংস করে দিতে পারল না। নেতাদের ওপর যখন আঘাত নেমে এলো তখন তাদের কাজ তুলে নিল শত শত নতুন কর্মী। নতুন তাদের উৎসাহ, অপরিসীম তাদের শ্রদ্ধা, তাই মূল দলে এল না ভাঙন; নৈরাশ্য আর নিষ্ক্রিয়তাও দেখা দিল না। কিন্তু কেন্দ্রীয় যন্ত্রটিরই তখন অভাব। তাই চরম মুহূর্তে সোভিয়েট রুশিয়ার উপর শত্রুর আক্রমণ যখন
অভাব। তাই চরম মুহূর্তে সোভিয়েট রুশিয়ার উপর শত্রুর আক্রমণ যখন
থাকবে, সুষ্ঠু নেতৃত্বেরও তখন অভাব দেখা দেবে।

'রেড রাইটসে'র একটা সংখ্যা দেখে বুঝতে পারলাম—একটি অভিজ্ঞ রাজনীতিকের ছোঁয়া এতে আছে। এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল এক প্রতিরোধ সংঘ থেকে। বলতে দুঃখ হচ্ছে, আমাদের একমাত্র পত্রিকা 'মে পেপারে'র সংখ্যা বিশেষ সাফল্য লাভ করেনি, কিন্তু কাগজ দেখে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, এর সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। তাই এবার আমরা পরস্পরের যোগাযোগ আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগলাম।

এ যেন গভীর বনে কাউকে খোঁজার মতোই ব্যাপার। স্বর শুনেই খোঁজের ধুম পড়ে গেছে। কিন্তু সেই স্থির শান্ত স্বর আবার শোনা যাচ্ছে একেবারে অন্য প্রান্ত থেকে; আমাদের পার্টির বিরাট ক্ষতি সবাইকে অত্যন্ত সাবধানী আর সজাগ করে তুলল: ফাঁদে ধরা পড়তে আর আমরা রাজি নই তখন। ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় পরিষদের দুজন সভ্য পরস্পরকে খুঁজে বার করতে গিয়ে কত বাধা বিপত্তি আর পরীক্ষার ভিতর দিয়ে পার হয়ে এল তার সীমা নেই। যাদের তারা বিশ্বাস করে যোগাযোগের ভার দিয়েছিল তারাই

সৃষ্টি করলো বাধা। এই দুইজন বিশ্বাসঘাতক কিনা বা তাদের সঙ্গে চাতুরি খেলছে কিনা সেই সম্বন্ধে তারা এমনি ধরনের পরীক্ষা করে নিশ্চিত হোল। আর, সব চাইতে বাধা ছিল এই যে, কার খোঁজ করছি তা আমি জানতাম না—তবু খোঁজ করছিলাম। সেও জানত না কে তার খোঁজ করছে।

এবার এমন একজন লোক পেলাম যে দুজনের হয়েই বলতে পারবে। চমৎকার ছেলে, ডাক্তার মাইলোস নেডভেড—সেই হোল আমাদের প্রথম দূত। ওকে হঠাৎ পেয়ে গেলাম। ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি অসুখ হোল আমার, লিডাকে পাঠালাম ডাক্তার নেডভেডকে বাকসাসদের বাড়িতে নিয়ে আসবার জন্য। সেইখানেই আমি লুকিয়ে ছিলাম। সে তক্ষুনি এল, তারপর কথাবার্তার ফাঁকে সে খুব গোপনে আমাকে জানাল যে, 'মে পেপারে'র সম্পাদকীয় যে লোকটি লিখেছে তাকে খুঁজে বার করবার ভার পড়েছে তার উপর। সে সন্দেহও করেনি যে, আমিই সেই লোক। কারণ, আমাদের ওদিকের সভ্যরা তখন জানত যে, আমি গ্রেফতার হয়েছি, আমাকে মেরে ফেলা হয়েছে।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলার সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করল। ঠিক সেদিন সন্ধ্যায় আমি আর হোনৎসা আমরা একখানা ইশ্‌তেহার বার করে জানিয়ে দিলাম দেশবাসীকে, চেকোস্লোভাকিয়ার দিক থেকে এই আক্রমণের অর্থ কি। ৩০শে জুন যাকে এতদিন ধরে খুঁজছিলাম তার দেখা পেলাম। আমি যে ঠিকানা দিয়েছিলাম সেই ঠিকানায় সে এল, কার সঙ্গে দেখা করতে আসছে—সে তখন তা জানত, কিন্তু তখনও তাকে আমি জানি না। গ্রীষ্মের রাত, আকাশিয়ার গন্ধে মদির প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের রাত। কথা বলবার আগে জানালার পর্দাটা ফেলে দিলাম। আলো জেবলে পরস্পরকে ধরলাম জড়িয়ে। সে হোনৎসা জিকা।

১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, কেন্দ্রীয় পরিষদের সবাই তখনও গ্রেফতার হয় নি। একজন পালিয়ে বেড়াচ্ছে, সে জিকা। বহু আগে থেকেই পরিচয় ছিল, খুবই ভালো লাগত তাকে। কিন্তু এবার সে পরিচয় দানা বাঁধলো এই গোপন আন্দোলনের কাজে। বেঁটে মোটা লোকটি, সব সময়েই মুখে হাসি—সার্বজনীন খুড়ো হবার পক্ষে চমৎকার—এবং পার্টির কাজে যেমন বিশ্বাসী তেমনি দৃঢ়। কখনও আপসের পথে সে চলতে চায় না। যে-কাজ করতে হবে তাকে, তা ছাড়া সে কিছু জানে না, জানতে চায় না। কর্তব্যের জন্য সে নিজেকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করেছে। সে জনগণের বন্ধু, জনগণও তাকে ভালবাসে। কিন্তু তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সে তাদের দাবিয়ে রাখতে চায় না।

দুজনের মতের মিল হতে শুধু কয়েক মিনিটমাত্র লাগল। ক'দিনের ভিতরেই নতুন নেতৃত্বের সভ্যের সঙ্গে পরিচয় হোল। গত মে মাস থেকেই জিকার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। সে হোনৎসা চার্নি। লম্বা চওড়া, রুচিবোধ সম্পন্ন এক যুবক, জনগণের সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গীও অপূর্ব। স্পেনে সে যুদ্ধ করেছে, তারপর যুদ্ধ বাধবার পর নাৎসী শাসিত জার্মানী পার হয়ে সে ফিরেছে দেশে, ফুসফুসে বইছে ক্ষত। সে যেন কড়া একজন সৈনিক—গোপন আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তীক্ষ্ণধী, সব কাজেরই অগ্রণী।

মাসের পর মাস নির্মম যুদ্ধের ভিতর দিয়ে আমরা হলাম কমরেড। মনের দিক থেকে আমরা এক, একই শিক্ষায় আমরা শিক্ষিত। জিকা সংগঠক, বাস্তববাদী, ভয়ানক রকম স্বল্পভাষী, বড় কথার মোহে সে প্রতাহিত হতে রাজি নয়। কোনো বিবরণীর ভিতর তলিয়ে গিয়ে সে তার সত্যিকারের রূপটা খুঁজে বার করে, প্রতিটি প্রস্তাব প্রতি সম্ভাব্য দিক থেকে পাঁচবার করে দেখে, তারপর তার দলের নির্দেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

চার্নি ধ্বংসাত্মক কাজ আর সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতির ভারপ্রাপ্ত। সামরিক পরিভাষায় সে ভাবে, নতুন নতুন উদ্ভাবনায় সে রত, বিরাট তার পরিকল্পনা। নতুন কর্মী আর নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কারে তার শ্রান্তি নেই, সফলও সে হয়।

আর আমি সাংবাদিক, রাজনীতিক আন্দোলনকারী, আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করেই চলি। কখনও বা একটু অদ্ভুত বলেই নিজেকে মনে হয়, ভারসাম্য আর একতা রক্ষার দিকেই আমার ঝোঁক।

আমাদের দায়িত্ব বিভক্ত বটে তবে কাজ একই। যখন কাজের আহ্বান আসত, আসত সঠিক উপায় নির্ধারণের সময় তখন আমরা পরস্পরের বিভাগে সাহায্য করতাম, দায়িত্ব নিতাম। তখন তো দেখা করে আলাপ-আলোচনা করবার সময় হোত না। ফেব্রুয়ারী মাসে পার্টির উপর আঘাত এসে পড়ল, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সব যোগাযোগ, সম্পূর্ণ মেরামত করবার উপায় আর রইল না।

পার্টির একটা বিশেষ বিভাগ ধ্বংস হয়ে গেলঃ কতকগুলো বিভাগ আবার গড়ে উঠল, কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন তখন অসম্ভব। বহু কারখানার সেলগুলোকে—এমন কি সারা দেশের সংগঠনকেই বিচ্ছিন্ন ভাবে মাসের পর মাস কাজ করতে হোলঃ তারপর বহু কষ্টে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হলাম। আমাদের শুধু তখন আশা, আমাদের প্রধান কাগজখানি তারা পায়—এবং তাতে যে সাধারণ নির্দেশ আছে সেই অনুসারেই চলে।

কাজ করা শক্ত, মাথা গোঁজবারই তখন ঠাঁই নেই। আগেকার আস্তানাগুলো আমরা ব্যবহার তখন করতে পারছি না, কারণ সেগুলো তখন শত্রুর কড়া নজরেই বোধহয় ছিল। প্রথমে আমাদের টাকা কড়ি ছিল না, রেশন কার্ড ছাড়া তখন খাদ্য যোগাড়ও শক্ত, আর রেশন কার্ড ব্যবহার করলে আমাদের পরিচয় ওরা জানতে পারত। এই সব বাধা অতিক্রম করে এগুতে হোল এমন সময়ে যখন প্রস্তুতি আর পুনর্গঠনের আশা আর নেই। তখন যুদ্ধে আমাদের সক্রিয় হবার সময় হয়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন হয়েছে আক্রান্ত।

আমাদের কর্তব্য আভ্যন্তরীণ সীমান্তে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ আমরা করব। শুধু আমাদের নিজেদের ফৌজ নিয়েই নয়, যতদূর সম্ভব চেক জাতির শক্তি নিয়োজিত করব সেই কাজে। ১৯৩৯ থেকে '৪১ সাল ছিল প্রস্তুতের বছর, পার্টি তখন গোপন কাজে ব্যস্ত, শুধু জার্মান পুলিসদের বিরুদ্ধেই নয়, সারা জাতির হয়ে চালাচ্ছে যুদ্ধ। সেই রক্তাক্ত উৎপীড়ন সত্ত্বেও পার্টিকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হোল তার সংঘশক্তি, তাকে দৃঢ়ীভূত করতে হোল, আর একই সময়ে জাতির বিশ্বাস অর্জন করবারও চেষ্টা করল। যারা কোন দলভুক্ত নয় তাদের কাছে গেল পার্টি, মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম করতে চায় তাকে নিয়েই শুরু হোল তার কাজ। যারা লড়াই করতে চায় তাদের দিল ডাক। যারা তখনও ইতস্তত করছে তাদের সঙ্গে শুরু হোল তার বোঝাপড়া।

১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে আমাদের পঙ্গু সংঘ যে আমরা আবার গড়ে তুললাম এ কথা বলতে চাই না, তবে এটুকু বলতে পারি, একটা সুনিয়ন্ত্রিত দৃঢ় ভিত্তি রচিত হোল। তখন আমরা যে কোন বড় কাজ করতে সক্ষম। আমাদের পার্টির প্রচার অভিযান দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। ধ্বংসাত্মক নীতি ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে, কারখানায় কারখানায় শুরু হোল ধর্মঘট। সেপ্টেম্বরের শেষে ওরা হেড্রিখকে লাগিয়ে দিল আমাদের পিছনে।

ক্রমবর্ধমান সামরিক আইনে আমাদের এই সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন ওরা দমন করতে পারল না প্রথম অধ্যায়ে। অবশ্য ওদের আঘাতে আমাদের অগ্রগতি কমে গেল, পার্টি আবার নতুন ক্ষততে ভরে গেল। সব চাইতে বেশী আঘাত পড়ল প্রাহা অঞ্চল আর যুবসংঘের উপর। আমাদের আরও ক'জন নেতার উপর আঘাত নেমে এলো,, পার্টির কাছে এঁদের মূল্য ছিল অনেক। তাঁরা হলেন—জ্যান ক্রেটি, স্তানৎজল, মিলোশ ক্র্যাসনি এবং আরও অনেকেই।

কিন্তু প্রত্যেক আঘাতের পরেই বুঝতে পারা যেত পার্টি কত অবিনাশী। যদি কোন কর্মীর অভাব অপূরণীয় হোত, দেখা যেত একজন হতকর্মীর

জায়গায় দুজন কি তিনজন নতুন কর্মী এসে দাঁড়িয়েছেন। নতুন বছরের শুরুতেই আমরা গড়ে তুললাম এক শক্তিশালী সংঘ। ১৯৪১-এর ফেব্রুয়ারীর মতো সুদূর বিস্তৃত না হলেও নিশ্চিত যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দেবার মতো ক্ষমতা তার ছিল। আমরা সবাই এ ব্যাপারে কাজ করেছিলাম, কিন্তু হোনৎসা জিকার কৃতিত্ব ছিল সব চাইতে বেশী।

আমাদের প্রকাশিত রচনাবলীর নিদর্শন আজও চোরা তাকে আর মাটির তলায় মদের চোরা কুঠরিতে পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে কমরেডদের লুকোনো ফাইলে। এখানে সেকথা বলার প্রয়োজন নেই।

আমাদের কাগজগুলির বহু প্রচার ছিল, আর শুধু পার্টির সভ্যরাই নয় সারা দেশ পড়ত সে কাগজ। ছেপে বার হোত কাগজ, কখনও বা মাইমিওগ্রাফে 'টেকনিক্যাল কেন্দ্র' থেকে বহু সংখ্যা প্রকাশিত হোত। সব কাজ হোত গোপনে, কাগজগুলি এমনি পরস্পরের সঙ্গে বিছিন্ন ভাবেই বেরুত। কোনও প্রকাশনা বিভাগই জানতে পারত না, অন্য বিভাগে কারা কাজ করছে, কোথায় কাজ চলছে। কোথা থেকে উপদেশ বা প্রবন্ধ আসছে কেউ জানত না। যুদ্ধের পরিস্থিতি অনুসারে মানুষের পক্ষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা কাজ করত। উদাহরণ দিচ্ছিঃ ১৯৪২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সৈন্যবাহিনীর উপরে কমরেড স্টালিনের দেওয়া আদেশ আমরা পরদিন ছেপে পাঠকদের হাতে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। মুদ্রাকররা সে দিন চমৎকার কাজ করে গেল, এমনি কাজ করত ফুচ-লোরেনৎস শাখার ডাক্তাররা। এই শাখা থেকে একখানা কাগজ, বেরুত, তার নাম 'হিটলারের বিরুদ্ধে দুনিয়া।' যাতে আর কেউ বিপদে না পড়ে তাই অন্য কাগজগুলির লেখা আমি নিজেই তৈরী করতাম। যদি আমি শেষ হয়ে যাই তাহলে আমার বদলে যে কাজ করবে তাকে অনেক আগে থেকেই তালিম দিয়ে রেখেছিলাম। আমি গ্রেফ্‌তার হবার পর সে তক্ষুনি নিজের হাতে কাজ তুলে নেয়, এখনও সে তাই-ই করছে।

যত সরল সহজ উপায় সম্ভব তা আমরা গ্রহণ করলাম। এক একটা কাজে যতদূর সম্ভব কম লোকই নিযুক্ত হোলো। সংবাদ পাঠানোর জটিল ব্যবস্থা আমরা বাতিল করলাম। ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারীতে এই ব্যবস্থা তো আমাদের কেন্দ্রীয় পরিষদকে বাঁচাতে পারেইনি, বরং বিশ্বাসঘাতকতার ভীতিই বাড়িয়েছে। এতে করে ব্যক্তিগত ভাবে আমরা প্রত্যেকেই বিপন্ন হলাম, কিন্তু গোপন আন্দোলনের যন্ত্রটি রইল নিরাপদ।

তাই আমি গ্রেফ্‌তার হবার পরও স্বাভাবিক ভাবেই কেন্দ্রীয় পরিষদ কাজ চালিয়ে গেল। আমার জায়গায় বসল আর একজন, আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা পর্যন্ত এই প্রভেদ বুঝতে পারল না।

১৯৪২ সালে ২৭শে মে, হোনৎসা জিকাকে গ্রেফ্‌তার করা হোল, সেও দৈবাৎ। হেড্রিখের হত্যার পরের রাত। সারা প্রাহার উপর চলছে শত্রুর হানা। ওরা স্ট্রেশোভিসের এক বাড়িতে ঢুকে পড়ল, সেখানে জিকা থাকত গোপনে। তার বেনামি পরিচয়পত্র ঠিকই ছিল। সে চুপ করে থাকলে ওরা ওকে লক্ষ্যই করত না। যাদের আশ্রয়ে সে ছিল সেই সদাশয় পরিবারকে বিপন্ন করতে তার ইচ্ছা হোল না। তাই সে তেতলার জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালাবার চেষ্টা করল, পড়ে গিয়ে সাংঘাতিক আঘাত লাগল মেরুদণ্ডে, তাকে ওরা নিয়ে গেল জেল-হাসপাতালে। কাকে ওরা ধরেছে তাও ওদের ধারণা ছিল না। আঠারো দিন ধরে খোঁজ-খবর আর ফটো মিলিয়ে দেখবার পর তারা প্রমাণ করল সে কে। তারপর মুমূর্ষু জিকাকে নিয়ে গেল পেটচেক বিল্ডিং-এ উৎপীড়নের জন্য। সেখানেই শেষবারের মতো দেখা। ওরা আমাকে তার সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে গেল। করমর্দন করলাম, সে হাসল তেমনি প্রশান্ত হাসিঃ

—জুলো, নিজের সম্বন্ধে সাবধান হও!

এই একটা কথাই ওরা তার কাছ থেকে শুনল। আর কোন কথাই সে বলেনি। মুখের উপর কয়েক ঘা পড়তেই সে মূর্চ্ছিত হলো, কয়েক ঘণ্টা পরে মারা গেল।

২৯শে মে-র ভিতরে ওর গ্রেফ্‌তারের খবর জানতে পেরেছিলাম। আমাদের গুপ্তচররা বেশ কাজ করছিল। আমাদের পরবর্তী কর্তব্য সম্বন্ধে ওদের মারফতেই সাব্যস্ত হোল, হোনৎসা চার্নি তাতে সায় দিল। পার্টির জন্য এই আমাদের একত্রে শেষ কর্তব্য নির্ধারণ।

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মে সে ধরা পড়ল। এবার কিন্তু দৈবাৎ নয়; ওর সঙ্গে জ্যান পোকোর্নির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল, তারই শৃঙ্খলা ভঙ্গের দুর্বুদ্ধি ওর ধরা পড়বার কারণ। দলের দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন অফিসারের কর্তব্য সে করেনি। কয়েক ঘণ্টা উৎপীড়ন, তা বেশ কঠোর অত্যাচারই বটে, কিন্তু সে কি প্রত্যাশা করেছিল?—হাঁ, কয়েক ঘণ্টা উৎপীড়ন সইবার পর সে ভীত হয়ে চার্নির সঙ্গে যে বাড়িতে তার দেখা হয়েছিল তারই ঠিকানা বলে দিল। সেখান থেকে ওরা হদিশ পেল তার—গেস্টাপোরা ওকে কয়েকদিন পরে গ্রেফ্‌তার করল।

ওকে যে মুহূর্তে এখানে নিয়ে এল, আমাকে সনাক্ত করবার জন্য টেনে হিঁচড়ে হাজির করল।

—ওকে চেন?

—না, চিনি না।

সেও আমাকে চেনে বলে স্বীকার করল না। আর প্রশ্নের উত্তর দিতেও সে নারাজ। দীর্ঘ উৎপীড়নের পালা তাকে সইতে হয়নি, তার পুরনো ক্ষত তাকে বাঁচালো। সে শিগগিরই মূর্চ্ছিত হোল। দ্বিতীয় পালার আগে আমরা ওকে পরিস্থিতি সম্বন্ধে সব খবরই দিলাম, সেও সেই অনুসারেই চলল।

তার কাছ থেকে কোন কথা বার করা গেল না। বহুদিন ওকে কয়েদ করে রাখা হোল, ওর নিস্তব্ধতা যাতে ভেঙে যায় এমনি প্রমাণ যোগাড়ের চেষ্টায় রইল ওরা। কিন্তু হোনৎসা চার্নিকে ওরা নোয়াতে পারল না।

বন্দীজীবনে সে বদলায়নি। সে রইল তেমনি সাহসী, আমোদপ্রিয় আর হাসিখুশি—সব সময়েই সে অপরকে ভবিষ্যতের নির্দেশ দিত—অথচ নিজের ভবিষ্যত তখন সোজা মৃত্যুর নির্দিষ্ট পথে চলেছে।

হঠাৎ ওরা এপ্রিলের শেষে প্যানক্রাটস্ থেকে ওকে নিয়ে গেল, কোথায় নিয়ে গেল জানি না। এখান থেকে হঠাৎ মিলিয়ে যাওয়ার মানে অশুভ হয়েই দেখা দেয়। হয়তো আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু হোনৎসা চার্নির সঙ্গে দেখা হবার আর আশা নেই।

মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া হয়েই ছিল। আমরা জানতাম, গেস্টাপোর হাতে পড়া মানেই সমাপ্তি। তাই ধরা পড়বার পরে আমাদের নিজেদের মধ্যে এবং অন্যদের সম্পর্কেও—যথাবিহিত কাজ করে যেতাম।

আমার জীবন-নাট্য এখানে উপসংহারের দিকে চলেছে। সে তো লিখতে পারব না, সে কেমন হবে তা জানি না। না, এ আর নাটক নয়। এই তো জীবন।

সত্যিকারের জীবনরঙ্গে তো দর্শক নেইঃ সবাইকেই ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়।

শেষ অঙ্কের যবনিকা উঠেছে।

বন্ধুগণ, তোমাদের আমি ভালবাসতাম। হুঁশিয়ার থেক!

৯ই জুন, ১৯৪৩ সাল।

—জুলিয়াস ফুচিক

গাস্তিনা-কে লেখা

প্রিয়তমা আমার,

হাওয়ায় উড়িয়া নিয়ে যাওয়া নদীর ঢালু পাড়ের ওপর ঠেস্ দেওয়া রোদ্দুরে দুটি ছোট্ট শিশুর মত দু'জনে হাত ধরে আর কোনদিন যে আমরা বেড়াতে পারবো, তার আশা কম। আবার কোনদিন যে আমি সুখে শান্তিতে লিখতে বসব, বন্ধুত্ব দিয়ে আমাকে ঘিরে রাখবে বই; আবার কোনদিন যে আমি লিখব সেই সব কথা, দুজনে আমরা যা দিনের পর দিন বসে আলোচনা করেছি, পঁচিশটা বছর ধরে যত কিছু আমার মধ্যে জমা হয়েছে, অঙ্কুরিত হয়েছে যত কিছু—তার আশা কম। আমার বইগুলোকে কবর দিয়ে ওরা এরই মধ্যে আমার জীবনের একটি অংগ খসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু হাল আমি কিছুতেই ছাড়বো না; হার মেনে নিয়ে জীবনের অন্য অংগটাকেও ২৬৭ নম্বরের এই শাদা কুঠুরীতে একেবারে নিঃশেষে মাটিতে মিশিয়ে দিতে আমি রাজী নই। তাই মৃত্যুর কাছ থেকে চুরি করে আনা এই সময়টুকুতে আমি চেক সাহিত্য নিয়ে লিখছি। সেই লেখাগুলো যে তোমাদের হাতে পেঁছে দেবে, তার কথা যেন কোনদিন এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যেও না। সে ছিল বলেই মৃত্যু আমাকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারে নি। তার দেওয়া কাগজ-পেন্সিল আমার মধ্যে যে আবেগ জাগায়, একমাত্র প্রথম প্রেমই তা পারে। শব্দগুলোকে বাক্যের ছাঁচে ঢালতে গিয়ে চোখ আমার খুলে যায়; আমি অনুভব করি, স্বপ্ন দেখি। মৌলিক মালমশলা ছাড়া গবেষণা ছাড়া লেখা শক্ত হবে। কাজেই যা আমার সামনে এত স্পষ্ট এবং এত কাছের জিনিস বলে মনে হচ্ছে যে হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারি—যাদের জন্যে আমি লিখছি, তাদের কাছে হয়ত সেটা অস্পষ্ট এবং অবাস্তব বলে মনে হবে। তাই সবার আগে, প্রিয়তমা আমার, আমি তোমার কাছেই লিখছি। তুমি আমার প্রথম সহযোগী, প্রথম পাঠক। আমার বলবার কথা তুমিই সব থেকে ভাল বুঝবে; সম্ভবত লাদা আর আমার পক্ককেশ প্রকাশকের সংগে বসে তুমিই ফাঁকগুলো দরকারমত ভরিয়ে নিতে পারবে। আমার হৃদয় আর মগজ্ গিজগিজ করছে, দেয়ালগুলোই শুধু ফাঁকা। লিখছি সাহিত্য নিয়ে, অথচ এখানে চোখ বুলোবার মত একটা চটি বইও নেই। কী বিশ্রি লাগে!

সব কিছু মিলিয়ে সত্যিই ভাগ্যের এ এক অদ্ভুত পরিহাস। তুমি তো জানো আকাশ আর মাটিকে, রোদ্দুর আর হাওয়াকে কী ভালই না আমি

বাসতাম। এদের বুকে জড়িয়ে যা কিছু বাঁচে—পাখীই হোক আর বন-বাদাড়ই হোক, মেঘই হোক আর মুসাফিরই হোক—সবার সঙ্গে মিশে যাবার কী দুরন্ত বাসনা ছিল আমার। তবু বছরের পর বছর একটানা দীর্ঘদিন আমি গা-ঢাকা দিয়ে থেকেছি—যেমন করে আত্মভোলা বিবর্ণ শিকড়ের দল অন্ধকার আর অবক্ষয়ের মধ্যে ডুবে থেকে জীবনের উদ্ভিন্ন মহীরুহকে তুলে ধরে। সে-ই তাদের গর্ব। সে গর্ব আমারও। কোন খেদ নেই আমার—কোন ক্ষোভ নেই। আমি লড়েছি পরিপূর্ণতার জন্যে। হাসিমুখেই লড়েছি। কিন্তু সব চেয়ে ভালবেসেছিলাম আমি তিমিরভেদী জ্যোতির্ময় আলোকে। যদি আমি তার কোলে বড় হতে পারতাম, বুক টান করে যদি পারতাম আকাশে মাথা তুলতে—কী ভালই না হত।

তবে তাই হোক।

যে মহীরুহকে আমরা কাঁধ দিয়ে ঠেলে তুলেছি, তার শাখায় শাখায় পল্লবিত হবে, মুকুলিত হবে, ফলবান হবে মানুষের এক নতুন ভাবীপুরুষ—শ্রমিক, কবি · আর সেই সঙ্গে সাহিত্যসমালোচক আর ঐতিহাসিকদের সমাজতান্ত্রিক উত্তরপুরুষ। আমি যা বলে যেতে পারলাম না, কালক্রমে সেই কথাই বলে যাবে, অনেক ভালভাবে বলে যাবে এই নতুন মানুষের দল। আমার পর্বতমালায় যদিও আর তুষার ঝরে পড়বে না, তবু আমার জীবনের ফল মধুময় হবে, পরিপক্ক হবে একদিন।*

প্যানক্রাটস্ ২৬৭নং সেল, ২৮শে মার্চ, ১৯৪৩

•

মা, বাবা, লিবা, ভেরা—প্রিয়জনেরা,

দেখেই বুঝবে, আমি ডেরা বদলেছি। আমি এখন বাউৎসেন বন্দীশালায়। ইস্টিশান থেকে আসতে দেখলাম বেশ ঝকঝকে তকতকে শহর—হৈ হট্টগোল নেই। বেশ লাগল। জেল-খানাটাও মন্দ নয়—অবশ্যই বন্দীদের পক্ষে জেলখানা যতটা ভাল লাগা সম্ভব। পেটেচেক প্যালেসের সেই ভুতের তাণ্ডবের পর এখানকার আবহাওয়া বড় বেশী জড়িয়ে-যাওয়া বলে মনে হচ্ছে। কেননা, এখানে আমরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা সেলে বন্দী। যাই হোক হাতে কাজ থাকলে সময় কোথা দিয়ে চলে যায় তার ঠিক থাকে না। এই সঙ্গে সরকারী যে নিয়মাবলী

---

* ফুচিক এখানে চেক সমালোচক এফ, এক্স, সাল্‌দা-র উক্তি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন: "আমার ফল এমন জাতের যা বেশীদিন পাকা থাকে না; দুঃখের প্রান্তর যখন কানায় কানায় কুয়াশায় ভরে যায়, তখন সেই ফল মধুময় হয়ে ওঠে। যখন পর্বতমালা প্রথম তুষারে ঢেকে যাবে, তখনই অন্ধকার বদ্ধ জলা থেকে কুয়াশা উঠে আসবে।"

পাঠাচ্ছি তাতে দেখতে পাবে এমন কি দু'চারটে পত্রিকাও আমি পড়তে পারি। কাজেই একঘেয়েমির অভিযোগ করতে পারি না। একঘেয়েমির কথাই যদি ওঠে, তাহলে বলব—একঘেয়েমি জিনিসটা মানুষের নিজেরই সৃষ্টি। কিছু লোক আছে যারা এমন সব জায়গায় গিয়ে বিরক্তি বোধ করে, যেখানে অন্য লোকে সুন্দরভাবে সার্থক জীবন কাটায়। আমার তো যে-কোন জায়গায় জীবন অদ্ভুত ভাল লাগে—এমন কি জেলখানাতেও। যেখানেই তুমি যাও শেখবার কিছু না কিছু পাবেই। এমন কিছু পাবে, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে—অবশ্যই তোমার সামনে যদি ভবিষ্যৎ বলে কিছু থেকে থাকে।

তোমাদের সব খবর তাড়াতাড়ি জানাও। এই সঙ্গে সরকারী যে নিয়মাবলী পাঠালাম, সেই অনুযায়ী কাজ করো। অর্থাৎ কোন পার্শেল পাঠিও না। বড় জোড় আমার নামে ওপরের ঠিকানায় দুচারটে টাকা পাঠাতে পারো। তোমরা সবাই আমার অন্তরের অভিনন্দন নিও। আবার আমাদের দেখা হবে, এই আশা নিয়ে তোমাদের আমি চুম্বন আর আলিঙ্গন জানাচ্ছি।

তোমাদের জুলা।

বাউৎসেন ,১৪ই জুন, ১৯৪৩

আমার প্রিয়জনেরা,

সময় কী ঝড়ের বেগেই না বয়ে যায়। এখান থেকে তোমাদের প্রথম যে চিঠি লিখেছি, মনে হচ্ছে যেন এই তো সেদিন। আবার আজ টেবিলে কালিকলম নিয়ে বসেছি।...একটা মাস চলে গেছে। পুরো একটা মাস। তোমরা হয়ত ভাবতে পারো, জেলখানায় বুঝি সময় কিছুতেই কাটতে চায় না। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। বরং উল্টো। প্রত্যেকটি ঘণ্টা আঙুলে গোণা যায়। স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় একেকটি ঘণ্টা কত ছোট, কত ছোট একেকটি দিন, একেকটি সপ্তাহ—কত ছোট গোটা জীবনটা। আমার সেলে আমি একদম একা, তবু নিঃসঙ্গ লাগে না। চারদিকে আমার ভালো ভালো সব বন্ধুঃ বই, আমার বোতাম বানানোর কল আর ভারি ভালমানুষ সঙ্গী আমার মোটা মাটির কল্‌সিটি। কল্‌সিটাকে দেখলে আমার আনন্দোচ্ছল তৃণের কথা মনে পড়ে যায়। জলের চেয়ে মদ দিয়ে ভরলেই তাকে মানাত ভালো। আর আমার সেল্‌টার একেবারে শেষ প্রান্তে আছে একটি ছোট্ট মাকড়সা। আমার এইসব বন্ধুদের সঙ্গে বসে আলোচনা করবার মত, ভাববার, মত, গাইবার মত কত কিছু যে আছে, তা বললে কেউ বিশ্বাসই

করবে না। বিশেষ ক'রে বোতাম বানানোর কলটা সব সময় আমার ঠিক মেজাজ বুঝে কথা বলে—আমরা পরস্পরকে খুব ভালভাবেই বুঝি। আমি যখন ওকে পালিশ করতে ভুলে যাই, শুধুমাত্র তখনই সে মাঝে মাঝে আমার ওপর বিরক্ত হয়। আর যতক্ষণ ও আমার কাছ থেকে আদরযত্ন না পাচ্ছে ততক্ষণ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে। এ ছাড়াও আরও বন্ধু আছে আমার। সেলে নয়, বাইরে যেখানে রোজ আমরা বেড়াই, সেই উঠোনে। উঠোনটা বড় নয়; তবে পাঁচিলটার ঠিক ওপারেই প্রকাণ্ড এক বাগান। সেখানে অনেকদিনের পুরনো বড় বড় সব গাছ। আমাদের ছোট্ট উঠোনের জমি-টুকুতে হরেক রকমের ঘাস আর ফুল—এতটুকু জায়গায় এত গাছপালা জড়াজড়ি করে থাকতে কখনও দেখিনি। কখনও মনে হয় কোন পাহাড়তলীর সবুজ প্রান্তর, কখনও মনে হয় গরু-চরানোর মাঠ। প্যান্সি ফুটে আছে এখানে ওখানে। সুন্দর সুন্দর পুতুলের মত ডেইজি ফুল, ব্লুবেল আর কালো-চোখ সুসান আর এমন কি ফার্ন—তাতা যেন নিছক অনাবিল আনন্দ। তাদের সঙ্গেও অনেক বিষয়ে কথা বলার আছে। এমনি করে লঘু পাখায় ভর ক'রে উড়ে যাচ্ছে দিন, উড়ে যাচ্ছে সপ্তাহ। একটা মাসও দেখ কেটে গেল।

পুরো একটা মাস কেটে গেল। তবু তোমাদের কোন চিঠি নেই। হপ্তা কয়েক আগে লিবা-র পাঠানো দশ রাইখমার্ক টাকার রসিদে সই করেছি। তাইতেই জানতে পারলাম তোমরা আমার শেষ চিঠি পেয়েছো, আমার ঠিকানাও তোমাদের অজানা নয়। এ পর্যন্ত তোমাদের কাছ থেকে কোন চিঠিই পেলাম না। হয়ত রাস্তায় খোয়া গেছে। আমাকে তোমরা চিঠি লিখো, লিখো কিন্তু, মাসে একবার তো লিখতেই পারো। তোমাদের খবরাখবর কী, কেমন ক'রে দিন কাটাচ্ছো লিখো। গাস্তিনার খবর দিও। তোমাদের সবাইকে চুম্বন আর আলিঙ্গন। আবার একদিন দেখা হবে।

তোমাদের জুলা।

বাউৎসেন, ১১ই জুলাই, ১৯৪৩

সোনা-মানিকেরা,

আগের মতই আছি। সময় উড়ে চলেছে। আর আমি তোমাদের কথা মত "মনের শান্তি" বজায় রেখেছি। বজায় না রাখার তো কোন কারণ দেখি না। আমি তোমাদের দুটো চিঠিই পেয়েছি। তোমাদের চিঠি পেলে মন আমার আনন্দে ভ'রে ওঠে। মানুষ চিঠির মধ্যে কত কী যে চায় কত কি যে পায়—তোমরা ভাবতেই পারো না। এমন কি যা তোমরা

লেখোনি তাও। তোমাদের কাছে আমার এত কথা বলবার আছে, কিন্তু কাগজ যে কিছুতেই বড় হতে রাজী নয়। আমার হাতের লেখা নিয়ে তোমরা কত খোঁটাই না দিতে। অন্তত এখন তোমরা আমার ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষর দেখে খুশিই হবে। এই চিঠির অর্ধেক গাস্তিনার। কেটে নিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিও। তবে তোমরা অবশ্যই আগে পড়বে। ও চিঠি তোমাদের জন্যেও লেখা। আমার মানিকেরা, যখন তোমরা গাস্তিনাকে চিঠি লিখবে, আমার ঠিকানাটা তাকে পাঠিয়ে দিও। সে যেন আমাকে চিঠি লেখার জন্যে অনুমতি চায়। তোমাদের চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে তোমরা ভাবছ, যে-লোকটার মাথার ওপর ফাঁসীর পরোয়ানা ঝুলছে তার বুঝি ও ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই। ঐ এক চিন্তাতেই যেন সে নিজেকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। ঠিক বুঝছ না তোমরা। আমি একেবারে শুরু থেকেই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আমার ধারণা, ভেরা তা জানে। তোমরা নিশ্চয় আমাকে কখনও তা নিয়ে যন্ত্রণা পেতে দেখনি। ও বিষয়ে আমি একেবারেই মাথা ঘামাই না। যারা বেঁচে থাকল, পেছনে পড়ে রইল যারা মৃত্যু শুধু তাদের কাছেই বড় নিষ্ঠুর। তাই আমি চাই তোমরা শক্ত হও, সাহসে বুক বাঁধো। তোমাদের সকলকে আমার চুম্বন আর আলিঙ্গন। আবার দেখা হবে।

তোমাদের জুলা।

বাউৎসেন, ৮ই জুলাই, ১৯৪৩

প্রিয় গাস্তিনা আমার,

এইমাত্র তোমাকে চিঠি লেখার অনুমতি পেয়েই লিখতে বসেছি। লিবা লিখেছে তুমি ডেরা বদ্‌লেছো। এ কথা কি তুমি ভেবে দেখেছো, প্রিয়তমা আমার—আমরা আর পরস্পর থেকে দূরে নই? ভোরবেলায় যদি তুমি টেরেজিন থেকে পায়ে হেঁটে উত্তর দিকে রওনা হও, বাউৎসেন থেকে আমি রওনা হই দক্ষিণে—তাহলে সন্ধ্যে নাগাদ আমাদের দেখা হবে। কাছাকাছি এসে দুজনে কী ছোটাই না ছুটব। আমরা এমন সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, যেখানে আমাদের পরিবারের অনেক স্মৃতি জড়ানো। তুমি আছো টেরজিনে যেখানে আমার কাকা* বিরাট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। আর আমাকে নিয়ে যাবে ওরা বার্লিনে—যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আমি অবশ্য মনে করি না, ফুচিক পরিবারের সবাইকেই বার্লিনে মরতে হবে। লিবা হয়ত

* সুরকার জুলিয়াস ফুচিক

তোমাকে লিখেছে—একা আমি একটা সেলে আছি, বোতাম বানাতে হচ্ছে আমাকে। আমার সেলের নীচের দিকের এককোণে আমার একটা ছোট্ট মাকড়সা আছে আর বাইরে আমার জানলার ওপর একজোড়া রবিন পাখী বেশ আরামে নীড় বেঁধেছে। কাছে, কত কাছে থেকে আমি তাদের শিশুর মত মিষ্টি কাকলি শুনি। তারা তাদের ডিম ফুটিয়ে বাচ্চার জন্ম দিয়েছে, দাম্পত্য জীবনের কতই না তাদের দুর্ভাবনা ছিল। ওদের দেখি আর তোমার কথা মনে পড়ে যায়। সেই যে তুমি মানুষের মুখের কথায় আমাকে পাখীর ভাষা বুঝিয়ে দিতে। প্রিয়তমা আমার, প্রহরে প্রহরে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলি। সেইদিনের জন্যে আমি সকাতরে প্রতীক্ষা করে আছি, যেদিন মুখোমুখি বসে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারব। তখন কত কথা জমে থাকবে দুজনে দুজনকে বলবার। প্রিয়তমা আমার, সাহসে বুক বাঁধো, শক্ত হও। তোমাদের সবাইকে আমার চুম্বন আর আলিঙ্গন। যতদিন না আবার দেখা হয়।

তোমাদের জুলা।

বাউৎসেন, ৮ই আগস্ট, ১৯৪৩

প্রিয় দুলালীরা,

হয়ত তোমরা ইতিমধ্যে জেনেছো, বার্লিনে আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে। ২৩শে আগস্ট আমি যখন তোমাদের চিঠির আশায় পথ চেয়ে আছি, তখন তোমাদের চিঠির বদলে এল বার্লিনে যাবার ডাক। ২৪শে আগস্ট গোর্লিৎস্ আর কট্‌বাস্ হয়ে আমি তখন বার্লিনের যাত্রাপথে। ২৫শে আগস্ট সকালে বিচার বসল। দুপুর না হতেই সব শেষ। যা ভাবা গিয়েছিল হুবহু তাই হল। এখন প্লট্‌জেন্‌সি জেলে এক সেলের মধ্যে আমি আর আরেকজন বন্ধু। আমরা কাগজের ঠোঙা বানাই আর গান গাই। আর আমাদের পালা কবে আসবে তারই অপেক্ষা করি। আর হপ্তা কয়েক আছে। কখনো কখনো সপ্তাহকে মাস বলে মনে হয়। শুকনো পাতার মত আস্তে চুপিসাড়ে আশা ঝরে যায়।

যারা কল্পনাবিলাসী, তাদের অনেকেই সেই ঝরে-পড়া দেখতে দেখতে মরীয়া হয়ে উঠত। কিন্তু তাতে গাছের কিছু যায় আসে না। এটা তো খুবই স্বাভাবিক, নেহাৎই মামুলি ব্যাপার! শীত যখন আসে গাছের মত মানুষকেও সে আগে থেকে গড়ে পিটে তৈরী করে নেয়। বিশ্বাস করো কেউই আমার অন্তরের আনন্দ কেড়ে নিতে পারেনি, কেউই নয়। আমার ভেতরকার সেই আনন্দ বিঠোফেনের সুরে সুর মিলিয়ে প্রতিদিন আমার সঙ্গে কথা

কয়। মুণ্ডুটা কেটে বাদ দিলেও মানুষ কখনও খাটো হয় না। সব কিছু শেষ হয়ে যাবার পর তোমরা আমাকে যখন স্মরণ করবে শোক ক'রো না—যে আনন্দ নিয়ে আমি চিরদিন বেঁচে থেকেছি, মনে সেই আনন্দ নিয়ে আমাকে তোমরা স্মরণ করবে—অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি তাই চাই। লোকে যখন চলে যায়, তখন কোন না কোন সময়ে দরোজায় খিল পড়ে। খুব ভাল করে ভেবে দেখো বাবাকে এ খবর দেওয়া, এমন কি এ সম্বন্ধে আকারে-ইঙ্গিতে কিছু বলাও ঠিক হবে কিনা। বুড়ো বয়সে তাঁকে কষ্ট না দেওয়াই বোধহয় ভাল। তোমরা নিজেরা যা ভাল বোঝো, তাই ক'রো—এখন তোমরাই হলে মা আর বাবার অনেক বেশী আপন।

গাস্তিনার খবর যা জানো লিখে পাঠাও। তাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন দিও। তাকে ব'লো যেন সে বরাবর নির্ভীক, বরাবর শক্ত থাকে; তার যে অগাধ ভালবাসা আজও আমি অনুভব করি, সেই ভালবাসা নিয়ে সে যেন নিঃসঙ্গ না থাকে। তার অজস্র যৌবন আর অনুভূতি আছে, তাই বৈধব্য বরণ করার অধিকার তার নেই। আমি চেয়েছিলাম সে সুখী হোক। আমি চাই আমার অভাবেও সে সুখী হোক। সে বলবে, তা হয় না। কিন্তু হয়। প্রত্যেকটি মানুষের জায়গা অন্যজন নিতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে, অন্যের হৃদয়ে। কিন্তু তাকে যেন এখনই এসব লিখো না। আগে সে ফিরে আসুক—যদি একান্তই সে ফিরে আসে। তোমরা নিশ্চয় জানতে চাও, জানতে চাও বৈকি, কেমন করে আমি দিন কাটাচ্ছি। বেশ ভালই কাটছে। এখানেও হাত আমার খালি নয়, তাছাড়া সেলের মধ্যে আমি একা নই, কাজেই সময় কেটে যাচ্ছে—আমার সঙ্গীটির মতে যেন বড্ড বেশী তাড়াতাড়ি কাটছে।

আমার প্রিয় দুলালীরা, তোমরা আমার আবেগভরা আলিঙ্গন ও চুম্বন নিও। আর—যদিও এ সময়ে শুনতে একটু কেমন কেমন লাগবে—যতদিন দেখা না হয়।

তোমাদের জুলা।

বার্লিন, প্রটজেনসি, ৩১শে আগষ্ট, ১৯৪৩

তোমাকে লিখেছে—একা আমি একটা সেলে আছি, বোতাম বানাতে হচ্ছে আমাকে। আমার সেলের নীচের দিকের এককোণে আমার একটা ছোট্ট মাকড়সা আছে আর বাইরে আমার জানলার ওপর একজোড়া রবিন পাখী বেশ আরামে নীড় বেঁধেছে। কাছে, কত কাছে থেকে আমি তাদের শিশুর মত মিষ্টি কাকলি শুনি। তারা তাদের ডিম ফুটিয়ে বাচ্চার জন্ম দিয়েছে, দাম্পত্য জীবনের কতই না তাদের দুর্ভাবনা ছিল। ওদের দেখি আর তোমার কথা মনে পড়ে যায়। সেই যে তুমি মানুষের মুখের কথায় আমাকে পাখীর ভাষা বুঝিয়ে দিতে। প্রিয়তমা আমার, প্রহরে প্রহরে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলি। সেইদিনের জন্যে আমি সকাতরে প্রতীক্ষা করে আছি, যেদিন মুখোমুখি বসে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারব। তখন কত কথা জমে থাকবে দুজনে দুজনকে বলবার। প্রিয়তমা আমার, সাহসে বুক বাঁধো, শক্ত হও। তোমাদের সবাইকে আমার চুম্বন আর আলিঙ্গন। যতদিন না আবার দেখা হয়।

তোমাদের জুলা।

বাউৎসেন, ৮ই আগস্ট, ১৯৪৩

প্রিয় দুলালীরা,

হয়ত তোমরা ইতিমধ্যে জেনেছো, বার্লিনে আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে। ২৩শে আগস্ট আমি যখন তোমাদের চিঠির আশায় পথ চেয়ে আছি, তখন তোমাদের চিঠির বদলে এল বার্লিনে যাবার ডাক। ২৪শে আগস্ট গোর্লিৎস্ আর কট্‌বাস্ হয়ে আমি তখন বার্লিনের যাত্রাপথে। ২৫শে আগস্ট সকালে বিচার বসল। দুপুর না হতেই সব শেষ। যা ভাবা গিয়েছিল হুবহু তাই হল। এখন প্লট্‌জেন্‌সি জেলে এক সেলের মধ্যে আমি আর আরেকজন বন্ধু। আমরা কাগজের ঠোঙা বানাই আর গান গাই। আর আমাদের পালা কবে আসবে তারই অপেক্ষা করি। আর হপ্তা কয়েক আছে। কখনো কখনো সপ্তাহকে মাস বলে মনে হয়। শুকনো পাতার মত আস্তে চুপিসাড়ে আশা ঝরে যায়।

যারা কল্পনাবিলাসী, তাদের অনেকেই সেই ঝরে-পড়া দেখতে দেখতে মরীয়া হয়ে উঠত। কিন্তু তাতে গাছের কিছু যায় আসে না। এটা তো খুবই স্বাভাবিক, নেহাৎই মামুলি ব্যাপার! শীত যখন আসে গাছের মত মানুষকেও সে আগে থেকে গড়ে পিটে তৈরী করে নেয়। বিশ্বাস করো কেউই আমার অন্তরের আনন্দ কেড়ে নিতে পারেনি, কেউই নয়। আমার ভেতরকার সেই আনন্দ বিঠোফেনের সুরে সুর মিলিয়ে প্রতিদিন আমার সঙ্গে কথা

কয়। মুণ্ডুটা কেটে বাদ দিলেও মানুষ কখনও খাটো হয় না। সব কিছু শেষ হয়ে যাবার পর তোমরা আমাকে যখন স্মরণ করবে শোক ক'রো না— যে আনন্দ নিয়ে আমি চিরদিন বেঁচে থেকেছি, মনে সেই আনন্দ নিয়ে আমাকে তোমরা স্মরণ করবে—অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি তাই চাই। লোকে যখন চলে যায়, তখন কোন না কোন সময়ে দরোজায় খিল পড়ে। খুব ভাল করে ভেবে দেখো বাবাকে এ খবর দেওয়া, এমন কি এ সম্বন্ধে আকারে-ইঙ্গিতে কিছু বলাও ঠিক হবে কিনা। বুড়ো বয়সে তাঁকে কষ্ট না দেওয়াই বোধহয় ভাল। তোমরা নিজেরা যা ভাল বোঝো, তাই ক'রো—এখন তোমরাই হলে মা আর বাবার অনেক বেশী আপন।

গাস্তিনার খবর যা জানো লিখে পাঠাও। তাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন দিও। তাকে ব'লো যেন সে বরাবর নির্ভীক, বরাবর শক্ত থাকে; তার যে অগাধ ভালবাসা আজও আমি অনুভব করি, সেই ভালবাসা নিয়ে সে যেন নিঃসঙ্গ না থাকে। তার অজস্র যৌবন আর অনুভূতি আছে, তাই বৈধব্য বরণ করার অধিকার তার নেই। আমি চেয়েছিলাম সে সুখী হোক। আমি চাই আমার অভাবেও সে সুখী হোক। সে বলবে, তা হয় না। কিন্তু হয়। প্রত্যেকটি মানুষের জায়গা অন্যজন নিতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে, অন্যের হৃদয়ে। কিন্তু তাকে যেন এখনই এসব লিখো না। আগে সে ফিরে আসুক—যদি একান্তই সে ফিরে আসে। তোমরা নিশ্চয় জানতে চাও, জানতে চাও বৈকি, কেমন করে আমি দিন কাটাচ্ছি। বেশ ভালই কাটছে। এখানেও হাত আমার খালি নয়, তাছাড়া সেলের মধ্যে আমি একা নই, কাজেই সময় কেটে যাচ্ছে—আমার সঙ্গীটির মতে যেন বড্ড বেশী তাড়াতাড়ি কাটছে।

আমার প্রিয় দুলালীরা, তোমরা আমার আবেগভরা আলিঙ্গন ও চুম্বন নিও। আর—যদিও এ সময়ে শুনতে একটু কেমন কেমন লাগবে—যতদিন দেখা না হয়।

তোমাদের জুলা।

বার্লিন, প্রটজেনসি, ৩১শে আগষ্ট, ১৯৪৩